আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা
১৬-৩১ মার্চ ২০১৯ ১-১৫ চৈত্র ১৪২৫

সেনাবাহিনী, রাজনীতি ও সংবিধান । দ্রোহের অধিকার । সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচন । হাস্যকর ও বিপজ্জনক । প্রচারমাধ্যমের অশ্রেয় প্রয়াস । আধা-বেওয়া । আতশকাচে মোদী সরকার । আন্তর্জাতিকতাবাদী থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভারত । নির্বাচনের যুদ্ধ— নির্বাচিত 'যুদ্ধ' । কলঙ্কিত বিজ্ঞান কংগ্রেস । দারিদ্র্য যেখানে পণ্য । সংবিধান ও জনগণের অবমাননা আর কতদিন? । শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব: সেকাল ও একাল । পাড়া-জীবনের লগ্নতা, স্মৃতিনির্মিত ইতিহাস । পূর্ব ও পশ্চিম

মূল্য : ২০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত

স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক

শুভনীল চৌধুরী

subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর

আরেক রকম

৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২

প্রতি সংখ্যা ২০ টাকা

বার্ষিক সডাক ৫০০ টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে ‘সমাজ চর্চা ট্রাস্ট’-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com

samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)

৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন

কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা

রবিন মজুমদার

৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা ১৬-৩১ মার্চ ২০১৯,
১-১৫ চৈত্র ১৪২৫

Vol. 7, Issue 6th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
প্রচ্ছদ ছবি: ধীরাজ চৌধুরী
ভিতরের ছবি: মনোজ দত্ত

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টৌটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা কুড়ি টাকা

বার্ষিক সডাক পাঁচশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

সম্পাদকীয়

সেনাবাহিনী, রাজনীতি ও সংবিধান ৫

দ্রোহের অধিকার ৭

সমসাময়িক

সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচন ১০

হাস্যকর ও বিপজ্জনক ১১

প্রচারমাধ্যমের অশ্রেয় প্রয়াস ১২

আধা-বেওয়া

শেখর দাশ ১৪

আতশকাচে মোদী সরকার

কৃষকবিরোধী মোদী সরকার

ঈশান আনন্দ ১৯

আন্তর্জাতিকতাবাদী থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভারত

দেবর্ষি চক্রবর্তী

দেবজিৎ ঠাকুর ২২

নির্বাচনের যুদ্ধ— নির্বাচিত 'যুদ্ধ': প্রসঙ্গ কাশ্মীর

ইমানুল হক ২৫

কলঙ্কিত বিজ্ঞান কংগ্রেস

মিহিরলাল রায় ৩০

দারিদ্র্য যেখানে পণ্য

নিখিলরঞ্জন গুহ ৩৫

সংবিধান ও জনগণের অবমাননা আর কতদিন?

বরুণ কর ৩৮

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব: সেকাল ও একাল

স্বপনকুমার ঘোষ ৪০

পাড়া-জীবনের লগ্নতা, স্মৃতিনির্মিত ইতিহাস

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য ৪৬

চিঠির বাক্সো ৫১

পুনঃপাঠ

পূর্ব ও পশ্চিম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫২

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা

দুই বছর : ৫০০ টাকা

তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ   উৎসা পট্টনায়ক   বি. রঘুনন্দন

সি. পি. চন্দ্রশেখর   জয়তী ঘোষ   বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট

নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

সেনাবাহিনী, রাজনীতি ও সংবিধান

বহু বছর আগে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবানী যখন তাঁর রথযাত্রায় রামের ছবি লাগিয়ে গোটা ভারতে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতি ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন, তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁকে ফোন করেন। জ্যোতিবাবু আডবানীকে রথযাত্রা বন্ধ করার অনুরোধ জানান। আডবানী জ্যোতিবাবুকে বলেন যে তিনি অপারগ, কারণ তাঁর দলের কর্মসূচি পালন করার থেকে কেউ তাঁকে বিরত করতে পারবে না। জ্যোতি বসু তখন বলেন, 'তাহলে রামের ছবি লাগিয়ে রথযাত্রা করছেন কেন? রাম কী আপনার পার্টি মেম্বার নাকি?' দেশের রাজনীতিতে আর কোনো জ্যোতি বসু নেই। থাকলে, বিজেপিকে নিশ্চিত জিজ্ঞেস করতেন, 'অভিনন্দন বর্তমানের ছবি সম্বলিত পোস্টার বিজেপি উত্তর ভারত জুড়ে লাগাচ্ছে কেন? অভিনন্দন কি বিজেপি-র পার্টি সদস্য নাকি?'

না। অভিনন্দন বর্তমান, বিজেপি-র পার্টি সদস্য নন। তিনি ভারতীয় বায়ুসেনার নির্ভীক পাইলট। ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারত পাকিস্তানের মাটিতে জঙ্গি ঘাঁটিতে যেই আক্রমণ চালায়, তার প্রত্যুত্তরে পাকিস্তানের বিমান ভারতের সীমা উল্লঙ্ঘন করলে, অভিনন্দন পাকিস্তানি বিমানের পিছনে ধাওয়া করেন। কিন্তু তাঁর বিমান পাকিস্তানের মাটিতে ভেঙে পড়ে। এবং তিনি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে বন্দি হন। গোটা দেশজুড়ে রব ওঠে যে অভিনন্দনকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত আনতে হবে। পাকিস্তানেও মিডিয়া তথা বুদ্ধিজীবীরা অভিনন্দনকে অক্ষত অবস্থায় ভারতে ফেরানোর দাবি তোলেন। আন্তর্জাতিক মহলও এই দাবিতে সোচ্চার হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে অভিনন্দনকে তিনি শান্তির জন্য ভারতে ফেরত পাঠাবেন। অবশেষে অভিনন্দন ভারতে ফেরেন।

কিন্তু অভিনন্দন পাকিস্তান থেকে এক নতুন ভারতে ফিরেছেন। এই ভারতে সেনাবাহিনীর কর্মরত অফিসারের ছবি লাগিয়ে নির্বাচনী প্রচার চলতে পারে। এই ভারতে পুলওয়ামা হামলায় নিহত জওয়ানদের ছবি প্রেক্ষাপটে লাগিয়ে ভোটের প্রচার করতে পারেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। এই ভারতে প্রশ্ন করা আপাতত মানা। বিশেষ করে বিমান

হানা সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন নাকি করা যাবে না। অথচ, সরকারের তরফ থেকে যে যা পারছে বলে যাচ্ছে। কখনো বলা হচ্ছে যে ৩০০-৪০০ জন জঙ্গি বিমান হানার ফলে মারা গেছে। বিজেপি সভাপতি দাবি করেছেন সংখ্যাটা ২৫০। অথচ, অভিনন্দনের সর্বোচ্চ আধিকারিকরা বলেছেন যে কতজন মারা গেছে সেই সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। বিদেশি সংবাদসংস্থারা ছবিসহ প্রমাণ পেশ করেছে যে বালাকোটে হামলায় সেই জৈশ-এ-মহম্মদ পরিচালিত মাদ্রাসার বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন তোলা বারণ।

ভারতের সংবিধান নাগরিকদের অধিকার দিয়েছে যেকোনো বিষয়ে প্রশ্ন করার। আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে চাই অভিনন্দনের মতন নির্ভীক পাইলটের জীবনবাজি রেখে, কয়েক কোটি টাকা খরচ করে, পাকিস্তানের সীমা পেরিয়ে বালাকোটে বিমান হামলার ফলে আমাদের ঠিক কী লাভ হল? এই প্রশ্ন করা জরুরি কারণ ভারতের সেনাবাহিনী তথা সৈনিকদের কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষুদ্র নির্বাচনী স্বার্থে ব্যবহার করছে কি না, তার উপরে নজর রাখার অধিকার ও দায়িত্ব আমাদের আছে। বিজেপি নেতাদের এই সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন করলে তারা সরাসরি প্রশ্নকর্তাকে পাকিস্তানের সমর্থক বলে দেগে দিচ্ছেন। তবু প্রশ্ন রয়ে যায়!

কতজন জঙ্গি বিমান হানায় মারা গিয়েছে, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল এই আক্রমণের ফলে কি সন্ত্রাসবাদ কমবে? ইরাক, সিরিয়া, আফগানিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। আফগানিস্তানে ২০০১ সালে জঙ্গি তথা তালিবান দমন করার নামে আমেরিকা আক্রমণ চালায়। তারপরে ১৮টি বসন্ত কেটে গিয়েছে, আমেরিকা এখনও তার সেনাবাহিনীকে আফগানিস্তান থেকে সরাতে পারেনি। জঙ্গি হানা অব্যাহত আছে, রোজ খবরের কাগজ তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। সিরিয়া তথা ইরাকে সন্ত্রাসবাদের কোনো চিহ্ন ছিল না। কিন্তু মার্কিনি হামলার ফলে আজ সিরিয়া ও ইরাক সন্ত্রাসবাদের সবথেকে ভয়ানক রূপ দেখতে পাচ্ছে আইসিসের মধ্যে। এই উগ্র মুসলিম মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনের জন্মই হয়েছে সন্ত্রাসবাদকে সামরিকভাবে পরাস্ত করার ভ্রান্ত নীতির জন্য। সিরিয়া, ইরাক বা আফগানিস্তানের থেকে আমেরিকা বহু দূরে। তারা চাইলেও মার্কিন মাটিতে আক্রমণ চালাতে পারবে না। কিন্তু, ভারত ও পাকিস্তান প্রতিবেশী। তাই ভারত সীমা পেরিয়ে বোমা ছুড়লে তার পরের দিনই প্রকাশ্য দিবালোকে পাকিস্তান ভারতে বোমা ফেলে যেতে পারে।

অতএব, দক্ষিণ এশিয়ায় সন্ত্রাসবাদের সমাপ্তি করতে হলে একদিকে পাকিস্তানকে বাধ্য করতে হবে জঙ্গি গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা না করতে। জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মঞ্চে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করতে হবে। কিন্তু কাশ্মীর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করতে হবে। মোদী সরকার কাশ্মীরে যে দমন নীতি নিয়ে চলেছে, আলোচনার সমস্ত পথ বন্ধ করে সামরিকভাবে কাশ্মীরিদের উপরে যে অত্যাচার নামিয়ে এনেছে, এর মাধ্যমে না কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব, না সন্ত্রাসবাদ কমানো সম্ভব। আবারও ইতিহাসের দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কোনো জনগোষ্ঠীর উপর শাসন চালানো যায় না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধান ব্যতিরেকে কোনো পথ নেই।

দ্বিতীয় যেই প্রশ্নটি তোলা আবশ্যিক তা হল এই যে সেনাবাহিনীকে প্রশ্ন করার অধিকার কি ভারতের জনগণের নেই? এমনকী বিরোধী রাজনীতিবিদরাও এই বার্তা দিচ্ছেন যে সেনাবাহিনী যেন প্রশ্নের ঊর্ধ্বে। তাঁরা বলছেন যে আমরা সেনাবাহিনী নয়, প্রশ্ন করতে চাই সরকারকে। কিন্তু বিজেপি আখ্যান নির্মাণ করছে যে সামরিক বিষয়ে সরকারকে প্রশ্ন করা মানেই সেনাবাহিনীকে প্রশ্ন করা, এবং সেনাবাহিনী যেহেতু প্রশ্নের ঊর্ধ্বে এহেন প্রশ্ন করা যাবে না। আমরা বলতে চাই এই প্রবণতা ও বক্তব্য ভয়ংকর। সেনাবাহিনী ভারতের সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়। ভারতের সংবিধান আমাদের অধিকার দিয়েছে যেকোনো বিষয়ে কথা বলার, প্রশ্ন তোলার। তাই সেনাবাহিনীকেও প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

ভারতের সেনাবাহিনীর দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে রাজনীতি থেকে দূরে থেকে পেশাদারিত্বের সঙ্গে সামরিক ও সুরক্ষার দেখভাল করার। উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সেনাবাহিনীর এই রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বিরল। পাকিস্তানের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেশটির সেনাবাহিনী ওখানে সর্বেসর্বা, রাজনীতির নিয়ন্ত্রক, মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে প্রশ্ন করলে গর্দান যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। বিজেপি কি 'নতুন ভারত'-কে পাকিস্তানের আদলে গড়তে চায়? যদি তা না হয়, তবে সেনাবাহিনীকে রাজনীতি থেকে অবিলম্বে দূরে পাঠাতে হবে। বিগত কয়েক দিনে সর্বোচ্চ সেনা আধিকারিকদের বক্তব্যে স্পষ্ট যে তাঁরা এই

দৈনন্দিন রাজনৈতিক বাকবিতন্ডার মধ্যে থাকতে রাজি নন। কিন্তু দেশের শাসকদল বর্তমানে সেনাবাহিনীর কাঁধে চেপে নির্বাচনী বৈতরনী পার হতে চাইছে। সেনাবাহিনীকে দেশের জাতীয়তাবাদের প্রতীকে পর্যবসিত করে তার প্রতি আনুগত্যকেই দেশপ্রেমের একমাত্র মাপকাঠি মনে করলে, আমাদের দেশের পাকিস্তানিকরণ সম্পূর্ণ হবে।

এখানে সবথেকে গুরুতর প্রশ্নটির অবতারণা করতে হয়। স্বাধীনতার ৭২ বছর পরে ভারতে জাতীয়তাবাদের যে বিতর্ক চলছে, তার মৌলিক ভিত্তি কী? ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদ ছিল তা সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। জাতীয়তাবাদের এই আখ্যানে অপর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ ও সাদা চামড়ার শোষকেরা। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ ব্রিটিশদের তাঁবেদারি করেছিল। তারা ছিল সাম্রাজ্যবাদের ও ব্রিটিশদের একনিষ্ঠ পূজারি। আজ তারাই দেশে জাতীয়তাবাদী হওয়ার ভড়ং করছে।

আসলে তাদের এই জাতীয়তাবাদ মূলত বিভেদকামী। এই জাতীয়তাবাদ আদতে কোনো ভবিষ্যৎ প্রগতির দিকে ধাবিত নয়। এই জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের চাকাকে পিছিয়ে নিয়ে তথাকথিত হিন্দু স্বর্ণযুগ ভারতে লাগু করতে চায়। তাই দেশের মানুষের জীবন-জীবিকার সর্বনাশ ঘটিয়ে একটি সরকার শুধুমাত্র কে দেশপ্রেমী তার শংসাপত্র দিতে ব্যস্ত থাকে। খুবই পরিষ্কারভাবে জাতীয়তাবাদের ধারণার ভিতরে আদতে নিহিত আছে তীব্র মুসলমান বিদ্বেষ। তাই বার বার মুসলমানদের দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। বার বার বলা হয় যে যারা হিন্দুত্বের বিরোধিতা করছে বা সরকারের সমালোচনা করছে, তাদের পাকিস্তানে চলে যেতে হবে।

ব্রিটিশ শাসন সমাপ্ত হওয়ার পরে ভারতের মতন একটি বিবিধ জাতি, ধর্ম, ভাষা, সম্মিলিত দেশকে একসূত্রে গাঁথা হয়েছে ভারতের সংবিধানের মধ্য দিয়ে। যারা সংবিধানে বিশ্বাস করেন তারাই প্রকৃত দেশপ্রেমী। যারা সেই সংবিধানকে ধ্বংস করে হিন্দু রাষ্ট্র গড়তে চায়, তারাই দেশদ্রোহী। বিজেপি-আরএসএস ভারতের সুমহান ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে হিন্দুত্বের জামা পরিয়ে এক ভয়াবহ ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্র নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে। যদি প্রকৃতভাবে দেশকে ভালোবাসেন, দেশের মানুষকে ভালোবাসেন তবে আরএসএস-বিজেপি-র মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগঠিত হোন। আজ বিজেপি সেনাবাহিনীকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে ভোটে জিততে চাইছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না হলে, এদের পরাস্ত না করতে পারলে, কাল আমাদের গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকবে কিনা এই প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

দ্রোহের অধিকার

সাপ ছোবল মারে ভয় পেলে, আত্মরক্ষার্থে। ছোবলটা সাপের শেষ অস্ত্র। অন্তত মানুষের থেকে সাপ যে কম বিপজ্জনক, সেটা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিস্মৃত হয়েছেন। আর তাই রাজ্য সরকারকে ইঙ্গিত করে তিনি একটি জনসভায় বলেছেন, যাঁরা যাঁরা পাকিস্তানে বিমান হানা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তাঁরা আসলে আস্তিনে লুকোনো বিষধর সাপ। উক্তিটির অন্তর্নিহিত কুরুচির প্রসঙ্গকে যদি বাদও দেওয়া যায়, তাহলেও এই প্রশ্ন উঠতেই পারে যে রাজ্যপালের মতো সাংবিধানিক পদে থেকে কেশরীনাথ ত্রিপাঠী কীভাবে বিজেপি-র মুখপাত্রের মতো আচরণ করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিমান হানা নিয়ে যে সংগত মন্তব্য করেছিলেন, যে হতাহতের প্রমাণ কোথায়, সেটাকে কেশরীনাথের মনে হতেই পারে সাপের ছোবল। সন্দেহ নেই, একটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এহেন কুশ্রী বিষোদ্গার করে তিনি বিজেপি কর্মীর যোগ্য আচরণই করেছেন। আর এদিক দিয়ে ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায়ও কেশরীনাথের সঙ্গে সমানে যেভাবে সঙ্গত করছেন, সেটাও সংবিধানের প্রতি বিজেপি কতখানি দায়বদ্ধ তার হাতেগরম প্রমাণ দিয়ে দেয়। তথাগত বলেছেন যে কাশ্মীরিদের বয়কট করা উচিত। শালওয়ালাদের কাছ থেকে কিছু কেনা উচিত নয়। কাশ্মীরে ঘুরতে যাওয়া উচিত নয়। এহেন মন্তব্যের পরেও এই দুজনের পদত্যাগের দাবি এখনও জোরালোভাবে উঠছে না, এটাই কি বুঝিয়ে দেয় না বিজেপি বর্তমান ভারতবর্ষকে ঠিক কোন অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

বস্তুত, ভারতবর্ষে বিজেপি যেভাবে গায়ের জোরে একটি সামাজিক সম্মতি নির্মাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা ফ্যাসিবাদের পূর্বপ্রস্তুতিই বলা যায়। নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কোনো স্বর, অথবা তাদের স্থির করে দেওয়া জাতীয়তাবাদের বিপ্রতীপে অন্য সমস্ত অস্তিত্বকেই তারা পায়ে টিপে মেরে ফেলতে উদ্‌গ্রীব। তাই পুলওয়ামাতে জঙ্গি হানার পর গোটা দেশজুড়ে যখন যুদ্ধের হিড়িক তোলা হল, হয়তো আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই তোলা হল, তখন সেই যুদ্ধবাজ স্বরটির যারা সামান্যতম বিরোধিতাও করলেন, তাঁদের বাড়ি বাড়ি চড়াও হল গেরুয়া সেনার দল। ঘাড় ধরে ক্ষমা চাওয়ানো হল, কারোর চাকরির জায়গাতে অভিযোগ জানিয়ে তাঁকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হল, আবার কলেজের অধ্যাপককে ঘিরে ধরে ওঠ-বোস করতে বাধ্য করল বানরসেনারা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্রান্তকে জোর করে বলানো হল, 'ভারতমাতার জয়'। এরকম বন্দুকের নলের গোড়ায় দেশপ্রেম প্রদর্শনের নমুনা দেখে বিবমিষা জাগে। একদল উগ্র, অসংস্কৃত এবং ভয়ংকর গুন্ডার দল তাদের মৌলবাদী উঠোনের চৌহদ্দিতে যে দেশপ্রেমের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে, সেই দেশপ্রেম অন্তত ভারতপ্রেম যে নয় তা নিশ্চিত করে বলা যায়। ভারতবর্ষের মতো এক বিশাল দেশ, তার প্রাচীন সংস্কৃতি এবং উদার মুক্তমনা ঐতিহ্যের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসকে অশিক্ষিত মৌলবাদী গেরুয়া হিন্দুত্বের সংকীর্ণ বাক্সে আঁটসাঁট করে ঢোকাতে চাইছে। তাদের নির্মিত ভারতবর্ষ আমাদের হতে পারে না।

আর বাকি থাকল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমিকা। সন্দেহ নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমান হানা অথবা বিজেপি-র এই মব লিঞ্চিং-এর বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু আগেও দেখা গেছে, হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে মমতার প্রতিরোধ 'লিপ সার্ভিস' দিয়েই শেষ হয়ে যায়। কাজের কাজ কিছু হয় না। পশ্চিমবঙ্গে যে যে ব্যক্তিদের বাড়িতে এরকম হিন্দুত্ববাদীরা হানা দিয়েছে, তাঁরা কেউই সুবিচার পাননি। যাঁদের চাকরি চলে গেছে, মমতা তাঁদের হয়ে অনেক গরম গরম কথা বলেছেন সত্যি, কিন্তু বাস্তবটা হল, তাঁরা এখনও কর্মহীন। সবথেকে বড়ো কথা, গেরুয়া বাহিনীর পক্ষ থেকে যারা যারা বিভিন্ন লোকের বাড়িতে এরকম হানা দিল, তাদের একজনকেও গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। প্রশ্ন জাগে, বামেদের নবান্ন অভিযানের দিন যে পুলিশকে রুদ্র সংহারক মূর্তিতে দেখা যায়, পঞ্চায়েত ভোটের দিন যে অনুব্রত মণ্ডল বা আরাবুলের দৃপ্ত পদচারণায় মেদিনী কম্পমান হয়ে ওঠে, বিজেপি-র বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নিতে গেলে সেই পুলিশ, বা সেই অনুব্রত আরাবুলের মতো তাজা ছেলেরা টেবিলের তলায় গিয়ে লুকোয় কেন? নাকি এটাও নবান্ন থেকে আসা নির্দেশ যে বিজেপি-র বিরুদ্ধে গর্জাও বেশি, বর্ষাও কম? কোন সারদার ঠাকুরঘরে যে কার টিকি বাঁধা, বোঝা দায়!

কিন্তু বিজেপি-র ন্যক্কারজনক ভূমিকা অথবা তৃণমূলের নিষ্ক্রিয়তার পরেও আরেকটা গভীরতর প্রশ্ন থেকে যায়। তা হল, দ্রোহের অধিকারের প্রশ্ন। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই বাড়ি বাড়ি গিয়ে জোর করে ক্ষমা চাওয়াবার ঘটনাগুলো মূলত ঘটছে গ্রাম ও মফস্সলে। আর শহরের নাগরিকদের জন্য? উত্তরটা সহজ। তাঁদের জন্য আছে ভারতীয় মিডিয়া। দেশের মধ্যে যুদ্ধোন্মাদনা ও মেকি জাতীয়তাবাদ চাগাড় দিয়ে তোলবার কাজটা ভারতীয় মিডিয়া ভয়ংকর সুচারুভাবে সম্পন্ন করছে। সবাই না হলেও অধিকাংশ। মিডিয়া এবং উগ্র দেশসেবক, দুজনেরই লক্ষ্য মূলত এক। জাতীয় সংহতির নাম করে, ভারতমাতার অজুহাত দিয়ে এক সমস্বত্ব, উচ্চবর্ণ-শাসিত একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলা, যার মধ্যে দিয়ে পুঁজির অবাধ চলাচল সম্ভব হয়। সেই চলাচলের বিরুদ্ধে যেকোনো প্রতিরোধকে তাই গুঁড়িয়ে দিতে হবে পুঁজির অথবা আদানি-আম্বানিদের স্বার্থে। অস্ত্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থেও বটে। কিন্তু এখানে যে প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক তা হল, প্রগতিবাদীরা দাবি করছেন, এবং সঠিকভাবেই দাবি করছেন যে, বিজেপি-র এই দেশপ্রেম মিথ্যে, লোকদেখানো। সেটা অবশ্যই, কিন্তু এখানে যে বিপজ্জনক ব্যাপারটা ঘটছে তা হল পুরো আখ্যান— কে দেশপ্রেমিক আর কে নয়, তার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। যদি এমন কেউ থাকেন যিনি সত্যিই দেশপ্রেমিক নন, যিনি 'নেশন' নামক আইডিয়াটিকেই অস্বীকার করেন অথবা দেশের উপরে অন্য কোনো আদর্শকে সততার সঙ্গে স্থান দেন, সেটা শ্রেণি হতে পারে, বর্গ হতে পারে বা লিঙ্গ হতে পারে, তাহলে কি তাঁর দেশকে অপ্রেমের এই অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে? তাহলে তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সবার আগে দেশদ্রোহী বলতে হয় কারণ তিনি জাতীয়তাবাদ নামক ধারণাটিকে আজীবন তীব্র আক্রমণ করে গিয়েছেন। প্রশ্নটা কিন্তু বিজেপি-র দেশপ্রেম বনাম বামপন্থীদের দেশপ্রেম নয়। প্রশ্নটা হল, দেশকে ভালোবাসার যেমন অধিকার আছে, দেশকে না ভালোবাসার অধিকারও কি থাকবে না? বামপন্থীরা এই অধিকার মেনে নেবেন তো?

দেশ বলতে যদি কেউ রাষ্ট্র মনে করে, তবে তাকে অস্বীকার করার, রাষ্ট্রকে শোষক শ্রেণির শোষণ যন্ত্র হিসেবে ভাবার অধিকার কি মানুষের থাকবে? যদি কেউ মনে করেন যে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়, তাহলে কি তাঁর সেই ভাবনার অধিকার কেড়ে নিতে হবে? ভারতের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী যেকোনো কথা, তা আপাতদৃষ্টিতে যতই রাষ্ট্রবিরোধী হোক না কেন, তা যদি সরাসরি হিংসার উসকানি না দেয়, বা সেই বক্তব্যের জন্য যদি হিংসা না হয়, তবে তাকে দেশদ্রোহ বলা যায় না। অথচ, বার বার দেশদ্রোহিতার মতন আইনকে কানহাইয়া, বা অন্য প্রতিবাদীদের বিরুদ্ধে সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। আজ কি ভারতের সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দল সমস্বরে বলতে পারবে যে ক্ষমতায় এলে তারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তৈরি করা দেশদ্রোহিতার আইন বাতিল করবে? কোনো রাজনৈতিক দলই সেই কথা বলবে না। কারণ দেশপ্রেমের যেই ধারণা বিজেপি তথা আরএসএস ভারতীয় কৌম সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, তাকে মৌলিকভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য যে বিকল্প রাজনৈতিক আদর্শ তথা আখ্যানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা বিরোধীদের বর্তমানে নেই। তাই বিজেপি বার বার চাইছে বিতর্কটিকে জাতীয়তাবাদ বনাম দেশদ্রোহিতার দিকে ঘোরাতে। আমাদের দুর্ভাগ্য, বিরোধী রাজনৈতিক পরিসরে দেশদ্রোহিতা, দেশপ্রেম, ব্যক্তি অধিকার দেশদ্রোহ আইনের বিষয়ে কোনো ব্যতিক্রমী চিন্তা দেখা যাচ্ছে না। তথাকথিত দেশপ্রেমে মত্ত এক হিংস্র ভারত থেকে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির'-এ উত্তীর্ণ হতে আমাদের ঢের দেরি। বিজেপি হয়তো ২০১৯ সালের নির্বাচনে হারবে। কিন্তু এই উন্নততর ভারত নির্মাণের রাজনীতির জন্য আমাদের বোধহয় অপেক্ষা করতে হবে বহু বছর!

সমসাময়িক

সপ্তদশ সাধারণ নির্বাচন

মার্চ মাসের শুরু থেকেই দেশের সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করছিল, কবে নির্বাচন কমিশন ১৭তম সাধারণ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করবেন। বিগত সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়েছিল ৫ মার্চ, ২০১৪ এবং জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণের কাজ শেষ করে। ৩ জুন ২০১৪ লোকসভা পুনর্গঠনের ঘোষণাপত্র জারি করা হয়েছিল। নির্বাচনের দিন ঘোষণায় বিলম্বের আপাত কারণ মনে হয়, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার কয়েক জন সদস্যের প্রচার কর্মসূচির ব্যাঘাত না ঘটানো। এই প্রচার মূলত সরকারি প্রকল্পের উদ্‌বোধন অথবা শিলান্যাস। অনেকটা সরকারি টাকায় ভোটের প্রচার। রাজ্য সরকারও এই সুযোগে, প্রতিদিন দৈনিক সংবাদপত্রে পাতার পর পাতা বিজ্ঞাপন দিয়ে সরকারের গুণগান করে চলেছে। মোদী, দিদি দুজনেই সরকারি টাকায় প্রচারের আলোকে থাকতে সমান দক্ষ। অবশেষে নির্বাচনের দিন ঘোষিত হল। ১১ এপ্রিল থেকে ৭ দফায় ৫৪৩ লোকসভা আসনে নির্বাচন পর্ব সমাপ্ত হবে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষে আর বেশি দেরি করা সম্ভব ছিল না। কারণ সপ্তদশ লোকসভাও জুন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গঠন করা হলে, রাষ্ট্রপতি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের নেতাকে নতুন প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করাতে পারবেন। সংবিধানের এই বিধান লঙ্ঘন করার কোনো পথ নেই।

নির্বাচন কমিশনের কাছে, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করার কাজ অনেক ক্ষেত্রে কঠিন থেকে কঠিনতর হচ্ছে। এর অন্যতম কারণ কিছু রাজ্যের বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি। যেমন ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়াড়ার বিস্তৃত বনাঞ্চলের সশস্ত্র মাওবাদী কার্যকলাপ। পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গলমহলেও বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময় যেরকম ত্রাসের পরিবেশ ছিল, এখন ওইসব জায়গায় প্রশাসন অনেক বেশি সক্রিয় এবং রাজ্য পুলিশ বা আধা-সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কোনোরকম সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায় না। কিন্তু তথাপি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন, নির্বাচন কমিশনের কাছে কঠিন দায়িত্ব। বিগত কয়েকটি নির্বাচনের ইতিহাস বলছে, শাসকদল নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছে। এই ইতিহাস মাথায় রেখেই হয়তো নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গে ৭ দফায় নির্বাচন পর্বকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ব্যাপকতম আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হবে। সঙ্গে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রপিছু ২৮ জন পর্যবেক্ষক। এর পরও কি নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে? নির্বাচন শুরু হলেই এই আশঙ্কা হয় দূর হবে নতুবা সত্যি হবে। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে কিন্তু এমনটি হয় না। এক সময় বিহারে নির্বাচন খুবই রক্তাক্ত হত। প্রচুর প্রাণহানিও হয়েছে। কিন্তু এখন খুবই শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়। দক্ষিণের সব রাজ্যে নির্বাচন প্রায় শান্তিপূর্ণ হয়। তামিলনাড়ুর মতো বড়ো রাজ্যে একদিনে নির্বাচন হয়। আরো অনেক বড়ো রাজ্যে এক দিন বা দু-দিনে নির্বাচন হয়। নির্বাচন নিয়ে ওইসব রাজ্যে চাপান-উতোর খুবই কম। রাজনৈতিক সচেতন পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম কেন, সাধারণ মানুষকেই এই বিষয়ে ভাবতে হবে। নির্বাচনে ভোটারই শেষ কথা হওয়া উচিত।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সাধারণ নির্বাচনে জনগণের মুখোমুখি হতে দ্বিধাগ্রস্ত। প্রধানমন্ত্রী ভালোভাবেই জানেন গত পাঁচ বছরে কত ভাষণ আর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আর মানুষের ভালোর জন্য কত কাজের কাজ করেছেন। বিজেপি ভয় পাচ্ছে মানুষের মুখোমুখি হয়ে ভোট চাইতে।

গত বছর হিন্দিবলয়ে যে বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে, এর ফলে বিজেপি নিশ্চয়ই চিন্তিত। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে, ছত্তিশগড়ে ওরা ক্ষমতা হারিয়েছে। গুজরাতে শেষ নির্বাচনে, বিজেপি এবং কংগ্রেস সমানে সমানে লড়াই করেছে। উত্তরপ্রদেশে আর ২০১৪ সালের অবস্থা নেই। উপনির্বাচনের ফলাফল তাই বলছে। বিরোধীরাও অনেক ঐক্যবদ্ধ। গতবার যে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে বিজেপি ৫৫ শতাংশ আসন লোকসভায় পেয়েছিল, সেই অবস্থা এখন নেই বলেই বিজেপি মনে করছে, ওরা ৫ বছরে মানুষের কাছে যে-সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিছুই পালন হয়নি। ফলে কৃষকের অসন্তোষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাছে। কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। মাঠে ফসল পচে যাচ্ছে। ঋণের দায়ে চাষি আত্মহত্যা করছে ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই। বেকারি বৃদ্ধি পেয়েছে ১০০ শতাংশ। ব্যাঙ্কে অনাদায়ী ঋণ বেড়েছে ৫ গুণ।

পুলওয়ামা হামলার পরে পরিস্থিতি দেখে মনে হয়, কেন্দ্রের

বিজেপি সরকার গত ৫ বছরে মোদী সরকার কী করল বা করতে পারল না, এই মুখ্য বিবেচ্য বিষয় থেকে বর্তমান যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির দিকে জনমত ঘুরিয়ে দিতে চাইছে। দুঃখের হলেও সত্য যে, বিজেপি সরকার যুদ্ধের নামে দেশে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সহজ পথ বেছে নিয়েছে। যারা মিথ্যে প্রচার করে তারা মিথ্যে প্রচার বার বার করে। হিটলারের সময় মিথ্যে প্রচার হত শুধু রেডিয়ো মারফত। ওটা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু, এখন বৈদ্যুতিন মাধ্যম অনেক ব্যাপক এবং বৃহৎ পুঁজির দখলে। ওরা শাসকদলের প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার। টেলিভিশনে সব সময়ই সার্জিক্যাল স্ট্রাইক-এ হতাহতের সংখ্যা, সীমান্তে জঙ্গি হামলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা চলছে।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলা সম্ভব। একদিকে বিরোধী দলের ঐক্যের মাধ্যমে ব্যাপক মানুষকে বিজেপিবিরোধী মঞ্চে নিয়ে আসা ও মানুষের কাছে নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য এবং মুখ্য বিচার্য বিষয়— জীবন ও জীবিকার বিষয়গুলি নিয়ে ব্যাপক প্রচার সংগঠিত করা। এই সরকার 'আচ্ছে দিন' আনতে পারেনি। পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধের মূল কারণ, কাশ্মীর সমস্যা শুধু বর্তমান বিজেপি সরকার নয়, বিগত ৭০ বছরে কোনো সরকারই কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে আগ্রহী ছিল না বা একে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধানের চেষ্টা করেনি। তাই কাশ্মীর সমস্যা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

সহজ ভাষায় বলতে গেলে জনগণের টাকা অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোষাগারের হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে কাশ্মীর সমস্যা জিইয়ে রাখা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমে এইসব আলোচনা বিশেষ হয় না।

সাধারণ নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, একদিকে ক্ষমতাশীল বিজেপি দল, যারা দেশের মানুষকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে বিভক্ত করে, পুলওয়ামায় আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের সুরক্ষা দেওয়ার ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষের আবহাওয়া বজায় রেখে, মানুষের চিন্তার অভিমুখ জীবন-জীবিকার চিন্তা থেকে, মানুষকে দেশাত্মবোধের আবেগে ভাসিয়ে দিয়ে নির্বাচনে বাজিমাত করতে চায়। অন্যদিকে, এর মোকাবিলার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সমস্ত বিরোধী দল। লড়াই হবে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন রকম। রাজ্যের নির্বাচনী লড়াই অনেকটা নির্ভর করবে রাজ্যের শাসকদলের অভিমুখের ওপর। আঞ্চলিক দলগুলোর অবস্থানও সব রাজ্যে সমান নয়।

পশ্চিমবঙ্গে শাসকদল কোনো আদর্শনিষ্ঠ দল নয়। ওদের বর্তমান অবস্থান বিজেপিবিরোধী। কিন্তু অতীত ইতিহাস বলে, ওরা বিজেপি-র সঙ্গে ঘর করতেও অভ্যস্ত। এই রাজ্যে নির্বাচনে অর্থবল এবং বাহুবল প্রধান ভূমিকা নিয়েছে বেশ কয়েকটি নির্বাচনে। এই অর্থবল এবং বাহুবলের বিচারে রাজ্যের এবং কেন্দ্রের শাসকদল সমানে সমানে পাল্লা দিতে পারবে। বাকি সব দলকে এই বাধা অতিক্রম করেই নির্বাচনে লড়তে হবে। রাজ্যের মানুষ ওদের ভয়ে ভীত হয়ে, অতীতের অনেক নির্বাচনে অসহায়ভাবে ওদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে, ভোট দিতে বাধ্য হয়েছে। মানুষকে বার বার বোকা বানানো যায় না। সাংগঠনিক শক্তি দিয়েই এর মোকাবিলা করা সম্ভব। মানুষের পাশে থেকে মানুষকে ভরসা দিতে পারলে, মানুষ যদি এককাট্টা হয়ে স্বেচ্ছায় স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে তাহলে নির্বাচনের ফলাফলে পরিবর্তন আনা অবশ্যই সম্ভব।

হাস্যকর ও বিপজ্জনক

আরেক রকম, সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় কলামে, আমরা রাফাল বিমান ক্রয় সংক্রান্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত করেছিলাম। সুপ্রিম কোর্ট, সরকারের বন্ধ খামের ভিতর পেশ করা নথি দেখে এই রায় প্রদান করেছিল যে রাফাল বিমান কেনা নিয়ে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়ম হয়নি। আমরা সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। বিগত কয়েক মাস ধরে 'দ্য হিন্দু' সংবাদপত্রে একের পর এক যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, তার থেকে পরিষ্কার যে কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টে তথ্য গোপন করেছিল এবং রাফাল বিমান কেনাকে কেন্দ্র করে দুর্নীতির অভিযোগ অমূলক নয়।

দ্য হিন্দু পত্রিকার বর্তমান কর্ণধার এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক এন রাম, তদন্তমূলক সাংবাদিকতার নয়া নজির কায়েম করে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের সামনে হাজির করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বারংবার এই দাবি করেছে যে ইউপিএ সরকারের তুলনায় সস্তায় তাঁরা রাফাল বিমান কিনছেন ফ্রান্সের থেকে। এন রাম সরকারি নথি থেকে তথ্য তুলে এনে জানাচ্ছেন যে এই দাবি মিথ্যা। ইউপিএ আমলে সরকার ফ্রান্সের থেকে ১২৬টি রাফাল বিমান কেনার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৭ সালের হিসেব অনুযায়ী একটি বিমান কেনার মোট খরচ ছিল ৯.০০৪১ কোটি ইউরো যা ২০১৬ সালের মোদী দ্বারা স্বাক্ষরিত চুক্তির পরে বেড়ে দাঁড়ায় বিমান প্রতি ১২.৮ কোটি ইউরো। এর প্রধান কারণ হল এই যে বিমানে ভারতের সুরক্ষার জন্য কিছু বিশেষ পরিবর্তন করা হবে যার জন্য খরচ ১৩০ কোটি ইউরো।

এই পরিমাণ অর্থ একটি বিমান কিনলেও দিতে হবে, ৩৬টি কিনলেও দিতে হবে আবার ১২৬টি কিনলেও দিতে হবে। যেহেতু মোদী ১২৬টির পরিবর্তে মাত্র ৩৬টি রাফাল বিমান কেনার চুক্তি করেন, বিমানপ্রতি খরচ বহুগুণ বেড়ে যায়। দেশের সুরক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকরা এই বিষয়ে আপত্তি জানান। কিন্তু তাদের আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শুধু তাই নয়। এন রামের প্রতিবেদন আমাদের জানাচ্ছে যে রাফালের দাম ঠিক করা ও অন্যান্য বিষয়ে ফরাসি সরকারের সঙ্গে যখন আলোচনা ও দর-কষাকষি চলছে, তখন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সমান্তরালভাবে ফরাসি সরকারের সঙ্গে আলোচনা চালায় এবং দেশের সরকারি আলোচনাকারী টিমের বক্তব্যকে খর্ব করে। এর বিরুদ্ধেও আধিকারিকরা আপত্তি জানান, এবং যথারীতি তা অগ্রাহ্য করা হয়। আবার, রাফাল চুক্তিকে সমস্ত দুর্নীতিবিরোধী নিয়মাবলীর বাইরে রাখা হয়। ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির জন্য ভারত সরকার ফ্রান্স সরকারকে বাধ্য করেনি যার জন্যও রাফালের দাম বেড়ে গিয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আধিকারিকদের মতামতকে অগ্রাহ্য করে মোদী একতরফাভাবে চুক্তি করেছেন যার ফলে রাফালের দাম থেকে শুরু করে আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

সরকার সুপ্রিম কোর্টের সামনে এই বিষয়গুলি বেমালুম চেপে গেছে। কিন্তু নাছোড়বান্দা কিছু ব্যক্তি ও উকিল সুপ্রিম কোর্টে আবারও আর্জি জানায় তাদের রায় পুনর্বিবেচনা করার জন্য। এই মামলার শুনানি চলাকালীন সরকারি আইনজীবী কোর্টে দাঁড়িয়ে যেই কথাগুলি বললেন তা একইসঙ্গে বিপজ্জনক ও হাস্যকর। তিনি দাবি করলেন যে যেই নথির ভিত্তিতে কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং হিন্দু সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে তা নাকি সুরক্ষা মন্ত্রকের দপ্তর থেকে চুরি গেছে। ভেবে দেখুন, দেশের সুরক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর, যেই দপ্তরে কাক-পক্ষীও সুরক্ষা বলয় পেরিয়ে ঢুকতে পারে না, সেখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ নথি চুরি হয়ে গেল! দেশজুড়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল, সামাজিক মাধ্যমে মোদী সরকার প্রবল বিদ্রূপের সম্মুখীন হল। এরপরে সরকারি আইনজীবী রাতারাতি তাঁর বয়ান পালটে নিলেন। বললেন যে তিনি বলেননি যে নথি চুরি হয়েছে। তিনি নাকি বলেছেন যে আসল নথি জমা না দিয়ে কোর্টে প্রতিলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। আসলে তিনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন। কোর্টের সামনে আজ এই কথা পরিষ্কার ভাবে উত্থাপিত হয়েছে যে সরকার তথ্য গোপন করেছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আধিকারিকদের যুক্তিগত আপত্তিকে উড়িয়ে দিয়ে মোদী গা-জোয়ারি করে রাফাল চুক্তিতে সই করেছেন। এখন সরকারি আইনজীবী হাসির খোরাক হচ্ছেন এবং এই পরিস্থিতিতে তিনি মোদী সরকারের পুরোনো নীতি মেনে ভীতি প্রদর্শন এবং হুমকির আশ্রয় নিচ্ছেন।

তিনি শাসিয়েছেন যে যাঁরা এই নথি ফাঁস করেছেন এবং যাঁরা তা ছেপেছেন, অর্থাৎ হিন্দু পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকারি গোপনীয়তা সংক্রান্ত আইন প্রয়োগ করা হবে। এই আইন তৈরি করেছিল ব্রিটিশ সরকার যার মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কণ্ঠরোধ করে তাদের জেলে পাঠাত। আজ স্বাধীন ভারতের একটি দায়িত্বশীল সংবাদপত্রকে এই আইনের ভয় দেখানো হচ্ছে। কিন্তু এন রাম, বিজেপি-র বশংবদ সাংবাদিক নন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে তাঁর তথ্যের সূত্র তিনি কোনো অবস্থাতেই কাউকে জানাবেন না। রাফাল সংক্রান্ত প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করা জরুরি ছিল কারণ তা জনস্বার্থবাহী। দেশের মানুষের জানার অধিকার রয়েছে কীভাবে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দপ্তর বার বার রাফাল চুক্তি প্রক্রিয়ায় অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে রাফালের দাম বাড়াতে সাহায্য করেছে। আজ যখন দেশে নির্বাচনী প্রক্রিয়া চলছে তখন দেশের মানুষ এই প্রশ্নগুলির উত্তর চাইবেন। সরকারি আইনজীবীর হাস্যকর ও বিপজ্জনক হুমকিতে জনগণ ভয় পাবেন না।

প্রচারমাধ্যমের অশ্রেয় প্রয়াস

নির্বাচনের মরশুম শুরুর আগেই প্রবল প্রতাপে শুরু হয়ে গেছে প্রচারের ঝড়। প্রচারের মাত্রা প্রতিদিন বাড়ছে। আত্মঘাতী আঘাত এবং প্রত্যাঘাতের ঘটনা রচনা করেছিল প্রচারের ভিত্তি। তাকে কেন্দ্র করে পরতে পরতে গড়ে ওঠা প্রচারের দাপটে দেশবাসী এখন দিশাহারা। বিভ্রান্তি অপনয়নের কোনো চেষ্টা নেই। প্রচারকদের ভাষা সুললিত নয়। ভাষণের সৌন্দর্য বৃদ্ধি নয়, ভাষাকে কদর্য করে তোলার অলিখিত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে।

বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এই বিরক্তিকর আবহে করে খাচ্ছে প্রচারমাধ্যম। দিনের পর দিন, পলের পর প্রতিটি অনুপল চলছে ধারাবাহিক প্রচার। বিপণনের বাজারে সবচেয়ে দ্রুত পচনশীল পসরা সংবাদ। ক্ষণে ক্ষণে বাতিল হয়ে যাচ্ছে আগের মুহূর্তের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। ফলে তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ নেই। পণ্য বেচতে গেলে হয়তো এমনটাই করতে হয়। নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। রবীন্দ্রনাথ রচিত,— '... সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নয়।...' বাক্যবন্ধকে সম্ভবত আপ্তবাক্য

হিসেবে শিরোধার্য করে দুর্দমনীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে প্রচার ব্যাবসা।

নিরন্তর প্রচারের ঘনঘটায় চাপা পড়েছে মানুষের স্বাভাবিক শুভ প্রবৃত্তি। দেশের সাধারণ নাগরিকের মনে দক্ষতার সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হচ্ছে ছদ্ম জাতীয়তাবাদের উগ্র ধারণা। নিত্যনতুন বিষয়ের অবতারণায় হারিয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিক বিচার-বিশ্লেষণ।

পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী আক্রমণের ঘটনা নিন্দনীয়। কিন্তু কেন এই ঘটনা ঘটেছে, নিরাপত্তা বাহিনীর যাত্রাপথ যথাযথভাবে সুরক্ষিত করার কাজে কেন গাফিলতি ছিল, এমন ভয়াবহ ত্রুটির জন্য কে দায়ী ইত্যাদি প্রশ্ন দানা বেঁধে ওঠার আগেই শুরু হয়ে গেল কাশ্মীরিবিরোধী হুংকার। হুমকি-হামলার পরিসরে সম্প্রচার করা হল বালাকোটে বিমান হানার খবর।

প্রচারের তীব্রতায় যুদ্ধজয়ের আনন্দ-উল্লাস বিকশিত। হর্ষচ্ছটায় আকাশ-বাতাস মুখরিত হওয়ার লগ্নে চলে এল বিমানবাহিনীর বৈমানিক পাকিস্তানে বন্দি হয়েছেন, এই খবর যুদ্ধবিমান ধ্বংস হওয়ার এক লহমায় অন্তর্হিত হয়ে জায়গা করে নিল বন্দি বৈমানিককে নিয়ে নানান রকমের আলোচনা-পর্যালোচনা। কেউ নিদান দিলেন এক্ষুনি যুদ্ধ শুরু হোক। কারো প্রশ্ন— এখনও পালটা আক্রমণ শুরু হয়নি কেন? আবেগে ভাসতে ভাসতে অনেকেই জানালেন যে বন্দিশালার তালা ভেঙে বৈমানিককে ছিনিয়ে আনা উচিত। বৈমানিকের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েও অনেকে উদ্‌বেগ প্রকাশ করলেন। ধৃত বৈমানিককে আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে যুদ্ধবন্দির মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও অনেকে জানতে চাইলেন। দেশের সীমানা থেকে বহু দূরে প্রচারমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে বসে এইসব প্রশ্ন-পরামর্শ উচ্চারিত হল। খবরের কাগজে লেখা হল অনেক কথা।

অতঃপর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ অপরাহ্ণে সংসদে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন যে ধৃত বৈমানিককে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। প্রচারমাধ্যম আবার মুখর। কবে-কখন-কীভাবে মুক্তিদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে তা হয়ে গেল মুখ্য বিষয়। সেই মুহূর্তে হ্যানয় থেকে ভেসে আসা একটি সতর্কবার্তা কারো নজরে এল না। অথবা বলা ভালো কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সংবাদটি অতি সন্তর্পণে পরিহার করা হল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হ্যানয়ের ব্যর্থ সফরের শেষে সাংবাদিকদের জানালেন যে ভারত ও পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা উচিত। এশিয়ায় দাঁড়িয়ে বিবাদমান দুই এশীয় দেশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে স্বদেশে রওনা হওয়ার আগেই পাকিস্তান সরকার অতিসক্রিয়তার সঙ্গে এই বিবৃতির স্বীকৃতি দিল। এবং সংসদে ঘোষিত হল যে ধৃত বৈমানিককে পরের দিনই দেশে পাঠানো হবে। এরপর শুরু হল প্রায় তিরিশ ঘন্টার টানটান নাটকীয় উত্তেজনা। বৈমানিকের দেশে ফিরে আসার পদ্ধতি-প্রক্রিয়া এবং সবশেষে ভারতে পদার্পণ প্রসঙ্গে প্রতি মুহূর্তের ধারাবিবরণী প্রচারমাধ্যমে সম্প্রচারিত হল। পুলওয়ামা, বালাকোট সংক্রান্ত সংবাদ কিন্তু ততক্ষণে তামাদি হয়ে গেছে।

পুলওয়ামায় সন্ত্রাসী হানা এবং বালাকোটে বিমান আক্রমণ প্রসঙ্গে বিরোধী দলগুলি সরকারকে নিঃশর্ত সমর্থন করে। নিজস্ব অবস্থান থেকে প্রতিটি দলই প্রতিশ্রুতি দেয় দেশের স্বার্থ রক্ষায় এইসব বিষয়ে কোনোভাবেই রাজনীতির রং লাগানো হবে না। তারা কথা রেখেছে। তবে শাসকদল এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দেয়নি। এবং তাদের ছোটো-বড়ো সব নেতাই এই সুযোগে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচার করে গেলেন। যুদ্ধের জিগির স্তিমিত হওয়ার আগেই সদর্পে প্রচারিত হতে থাকল জাতীয়তাবাদ। সরকারি মঞ্চ থেকেও প্রচার চালানো হল। উগ্র জাতীয়তাবাদ এমন এক সংক্রমণ যা যুক্তি-তর্ক বোধ-বুদ্ধির ধার ধারে না। ফলাফল— দেশের এখানে-ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে জাতীয়তাবাদ শেখানোর নামে শুরু হল সংগঠিত আক্রমণ। তবুও শাসকের হুংকারধ্বনি প্রচারমাধ্যমে নিয়মিত দেখানো-শোনানো-পড়ানো বন্ধ হয়নি।

পুলওয়ামার নিহত-আহত নিরাপত্তা কর্মীরা আর খবরে নেই। দেশে ফেরা বৈমানিককে নিয়েও আর কোনো খবর হচ্ছে না। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের ছবি ও খবরে বালাকোটে বিমান আক্রমণ প্রশ্নের সম্মুখীন। এক হাজার কিলোগ্রাম বিস্ফোরক বর্ষণের পরে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা নানা রকমের কথা বলছেন। সরকারি বয়ানে কিন্তু কোনো সংখ্যা উচ্চারিত হয়নি। এবং যথারীতি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। উগ্র জাতীয়তাবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে প্রয়োজনে ফৌজের আধিকারিকদের মাধ্যমেও কাশ্মীরিদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। সবমিলিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ গোটা দেশে এক শ্বাসরোধকারী পরিবেশ তৈরি করেছে। সংবাদমাধ্যম নৈর্ব্যক্তিক নীরবতায় অবগাহনের নীতিকেই শ্রেয় মনে করছে।

গত পাঁচ বছরের প্রশাসনিক ব্যর্থতা, লাগামছাড়া দুর্নীতি, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেশবাসীর চোখে ধরা পড়ে যাওয়ায় উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষ মিশিয়ে লোকসভার আসন্ন নির্বাচনে শাসকদল ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। এই ভয়ংকর হাতিয়ার ভারতীয় সমাজকে বিপন্ন করতে সক্ষম। সহ-নাগরিকের প্রতি অবিশ্বাস, অসহিষ্ণুতা গড়ে তুলতে পারে এক ভয়াবহ শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশ। ভারতীয় গণতন্ত্র অবশ্য স্বৈরতন্ত্রকে কোনোদিনই মেনে নেয়নি। সেই ইতিহাসের উপর ভরসা রেখে বলা যায় ভেদাভেদের রাজনীতির প্রবর্তনকারী বর্তমান শাসকের উদ্ধত আচরণ চূড়ান্ত বিচারে পর্যুদস্ত হবে। উসকানিমূলক ধারাবাহিক সংবাদ পরিবেশন বন্ধ করার জন্যে সমস্ত রকমের প্রচারমাধ্যমের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় এই বিপদ থেকে প্রচারমাধ্যমও আগামী দিনে বাদ যাবে না।

আধা-বেওয়া

শেখর দাশ

মুনীর রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। বাড়ি ছিল বরামুল্লাতে। বাবা-মা, স্ত্রী-চার সন্তান, দুই ভাই, চার বোন নিয়ে তাঁর বিরাট সংসার। ২০০৩-এর বর্ষার এক গভীর রাতে কাশ্মীরের দ্বিতীয় রাস্ট্রীয় রাইফেল (প্যারা মিলিটারি)-এর জওয়ানরা মুনীরদের বাড়ির দরজায় ধাক্কা দেয়। বাড়ির বড়ো ছেলে হিসেবে মুনীরই দরজা খোলেন। আগন্তুকদের বসার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান। কিছু কথাবার্তার পর মুনীরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মিলিটারি ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। নিয়ে যাওয়ার সময় জওয়ানরা বলে যায়, পরের দিন সকালে মুনীরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মুনীর ফেরেননি।

ওই ঘটনার পর থেকেই মুনীরের স্ত্রী হেনার দোজখ-জীবন-যাপন শুরু হয়। থানা, মিলিটারি ক্যাম্পের মতো সম্ভাব্য সমস্ত জায়গাতেই হেনা এবং পরিবারের লোকেরা মুনীরের খোঁজে যোগাযোগ করেন, কিন্তু কোনো জায়গা থেকেই কোনো খবর মেলে না। যে বাহিনী মুনীরকে তুলে নিয়ে গেছিল, তাদের মধ্যে দু-চারটে পরিচিত মুখও ছিল— তাদের কাছে খোঁজ করেও হেনা স্বামীর কোনো খবর পাননি। বরং বাহিনীর কেউ কেউ বলেছিল মুনীর সীমানা পার করে পাকিস্তানে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী দলে নাম লিখিয়েছে! সেই কথায় কান না দিয়ে হেনা একটা শিকারা ভাড়া করে কিছুদিন জলে জলে ভেসে বেরিয়েছেন, যদি মুনীরকে খুন করে জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর দেহটা অন্তত পাওয়া যাবে সেই আশঙ্কায়। সেই জল-সফরেও কোনো ফল পাওয়া যায়নি। আশা, আশঙ্কা সবই ব্যর্থ হওয়ায় কাশ্মীরের কাবিল মানবাধিকারকর্মী, আইনজীবী পারভেজ ইমরোজের চেষ্টায় হেনা আদালতে মামলা করেন। কিন্তু সেই মামলার গতিপ্রকৃতি খুবই হতাশাজনক। খোঁজখবর ইত্যাদির মাঝে একটা কঙ্কাল একবার সামান্য উত্তেজনা ছড়িয়েছিল বটে, কিন্তু সেই বিকৃত দেহাবশেষ কোনো দুরস্ত জবাব দিতে পারেনি। কেননা, ওই কঙ্কাল মুনীর বা কাশ্মীরে হারিয়ে যাওয়া হাজার হাজার যুবকের যেকোনো একজনের হতে পারে। কঙ্কালের ডিএনএ টেস্ট হয়েছিল কিনা, হলেও তার কী নতিজা— হেনা কিছুই জানতে পারেননি।

সময় গড়িয়েছে। সময়ের নিয়মেই হেনার জীবন-সংকটও বেড়েছে। মুনীরের বাবা-মা, ভাই-বোনদের সঙ্গে থাকলেও হেনাকেও কাজকর্মের খোঁজে বাইরে যেতে হয়েছে। কারণ, হেনা বা তাঁর ছেলে-মেয়েদের সবরকম দায়দায়িত্ব সামলানোর মতো আর্থিক তাকত মুনীরের পরিজনদের ছিল না। হেনার বদ-নসিবের দায়ভার নেয়ার আগ্রহও তাঁরা হারিয়েছিলেন। ফলে বাইরের সঙ্গে সঙ্গে হেনাকে ঘরেও কঠোর আঁধির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ঘরের বাইরের ঝঞ্ঝা সামলে হেনা তাঁর ছেলে-মেয়েদের শুধু গায়ে-গতরেই বড়ো করতে পেরেছিলেন, লেখাপড়া বা অন্য কোনো সুস্থ-সুন্দর চর্চায় তাদের শামিল করতে পারেননি। তাই কৈশোরেই বড়ো ছেলে রিয়াজকে অদক্ষ শ্রমিকের খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল। তাতেও অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়নি। কারণ, রোজ তো অন্যের বাগানে কাজ থাকে না— কাজ না-থাকলে সংসারের চাপা পড়া আগুন জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। সেই আগুনে ভালোবাসা, সম্পর্ক সবকিছুই পুড়ে ছারখার হয়ে যায়— গেছেও— কষ্টে যন্ত্রণায় মুনীরের বাবা বউমাকে বলে দিয়েছেন, আবার একটা বিয়ে করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু হেনা এতদিনে বুঝে গেছেন আগুন অত সহজে নেভে না!

মোদী বা আরএসএস ক্ষমতায় থাকলে কাশ্মীর তথা তামাম ভারতের মুসলিমদের জীবনযাপন যে কী বীভৎস হয়ে উঠতে পারে তা আমরা এখন নিজেদের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এই পাঁচ বছরের সঙ্গে আগের বিশ-পঁচিশ বছর যোগ করলে গত প্রায় ৩০ বছর ধরেই কাশ্মীরের মানুষেরা যে বীভৎস জীবন কাটাচ্ছেন তার একটা উদাহরণ ওই মুনীর বা হেনার ঘটনা। হেনা-র মতো অনেক যুবতী-ই তাঁদের সঙ্গীকে হারিয়ে এক আজীব জীবন কাটাচ্ছেন। কাশ্মীরের সরকারি ভাষ্যে এই মানুষগুলোই অর্ধেক-বিধবা— আধা-বেওয়া নামে পরিচিত। এঁদের সরকারি বা সামাজিক কোনো স্বীকৃতি নেই— ফলে আধা-বেওয়ারা এক আধমরার জীবন কাটাচ্ছেন। সন্তানদের মুসিবতও মারাত্মক।

১৯৪৭-এর দেশভাগের ঝঞ্ঝার রেশ কাটার বেশ কিছুকাল পর, মোটামুটি '৮৮-'৮৯ থেকে আবার কাশ্মীরের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হতে শুরু করে। শুরু হয় ভারতের হাত থেকে কাশ্মীরকে স্বাধীন করবার আন্দোলন। তবে, অনেকের মতে ওই আন্দোলন পাকিস্তানের মদতপুষ্ট। কারণ, পাকিস্তান ভারতের অধীনে থাকা অংশটুকু দখল করে পুরো কাশ্মীরকে নিজের দখলে নিতে চায়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিরুদ্ধে ওঠা এই অভিযোগ পাকিস্তান পুরোপুরি অস্বীকার করেছে। কিন্তু গত সত্তর বছর ধরে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যা মতিগতি তাতে ওই অভিযোগের সারবত্তা রয়েছে একথা অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু এই বিতর্কের জটিল আন্তর্জাতিক আবর্তে না ঢুকে আমরা আপাতত কাশ্মীরের একেবারে নিজস্ব, ভয়ানক এক সংকটে নজর দেওয়ার চেষ্টা করব।

ওই ১৯৮৮-'৮৯ সাল থেকে কাশ্মীরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা মারাত্মকভাবে বেড়ে চলেছে। সরকার সেনার (গায়ের) জোরে কাশ্মীর সমস্যা তথা জঙ্গি আন্দোলনকে নির্মূল করা। কিন্তু, আমরা দেখতে পাচ্ছি, সরকারি ঔদ্ধত্যের ইন্ধনে ওই আন্দোলনের আগুন তো নিভছেই না বরং তা মাঝে মাঝেই দাবানলের চেহারা নিচ্ছে। আর ওই দাবানলকে কাবু করতে সরকার কাশ্মীরে বছরের পর বছর সেনার সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছে! মোদীর পাঁচ বছরে সেনাবাহিনীর দানবীয় আচরণে বা সেনাপ্রধানের আস্ফালনে কাশ্মীরের মানুষের প্রতি ভারত-ভাগ্য-বিধাতাদের মনোভাব উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়ে গেছে! কাশ্মীরে এখন সেনা, আধাসেনা, পুলিশ ইত্যাদি মিলিয়ে জওয়ানের সংখ্যা প্রায় সাড়ে সাত লাখ। বিভিন্ন সেনাছাউনি ছাড়াও তাদের দখলে রয়েছে প্রায় দু-হাজার হাসপাতাল, স্কুল, হোটেল, সরকারি বাড়ি ইত্যাদি। শুধু মারাত্মক সংখ্যক সেনাই নয়, রয়েছে *ডিস্টার্ব এরিয়াস অ্যাক্ট, আর্মড ফোর্সেস (স্পেশাল আর্মস) অ্যাক্ট,* পাব্‌লিক সেফ্‌টি অ্যাক্ট-এর মতো কিছু পাশবিক আইন। বকলমে যে আইনগুলো জওয়ানদের হাতে কাশ্মীরিদের নিয়ে যা খুশি করার ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। অথচ ওই জওয়ানদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মানুষের হাতে জোরালো কোনো রক্ষাকবচ নেই। — সরকারি হিসেবে কাশ্মীরে সক্রিয় জঙ্গির সংখ্যা পাঁচ-শোরও কম— পাঁচ-শো জঙ্গি সামলাতে সাড়ে সাত লাখ সেনার যে দরকার হয় না সেকথা বুঝতে অঙ্কে পণ্ডিত হতে হয় না! আসলে ওই ব্যাপক সংখ্যক সৈন্য কাজে লাগিয়ে প্রশাসন কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। ওই নিয়ন্ত্রণেই চাপেই গত তিরিশ বছরে কাশ্মীরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাধারণ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। আর হারিয়ে যাওয়া মানুষের সঠিক সংখ্যা কেউ জানেন না। ওই হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর সঙ্গেই জুড়ে রয়েছে কাশ্মীরের অর্ধেক-বিধবাদের নিয়তি।

এ লেখার শুরুতেই আমরা হেনার কথা পড়েছি। হেনার মতো অর্ধেক-বিধবাদের জীবন-সংকটে নজর দিতেই এই লেখার অবতারণা। হেনাদের দোজখ-যাপনের কয়েকটা ছবি আমরা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো:

ক. যেকোনো মানুষ হারিয়ে গেলেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরিজনেরা সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় তাঁর খোঁজে ছোটেন। কাশ্মীরের থানা বা সেনা ছাউনিগুলোর অনেকগুলোতেই ডিটেনশন ক্যাম্প চলে। যেখানে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনেক মানুষকেই অনুমতি ছাড়াই আটকে রাখা হয়। ওইসব ক্যাম্পগুলোতে প্রিয়জনকে খুঁজতে গিয়ে মহিলাদের অনেকেরই কর্তৃপক্ষের আর্থিক বা অন্য লালসার শিকার হওয়ার ঘটনা কাশ্মীরে অপরিচিত নয়। তবু মরিয়া হয়েই স্বামীর খোঁজে অনেক সময় মহিলারা একা একাই সেখানে যেতে বাধ্য হন।

খ. নিখোঁজ মানুষটিকে খুঁজে পেতে এফআইআর করা খুব জরুরি কিন্তু এক ঝঞ্ঝাটের কাজ। কাশ্মীরে যেকোনো নিখোঁজ পুরুষকে সেনা বা প্রশাসন খুব সহজেই জঙ্গি বলে দেগে দেয়। তারা মনে করে নিখোঁজ সকলেই অস্ত্রের ট্রেনিং নিতে কাশ্মীরে পালিয়ে গেছে। ফলে থানা এফআইআর নিতে চায় না। তখন থানার অনাগ্রহ কাটানোর জন্য ভুক্তভোগীকে কিছু 'খরচ' করেই এফআইআর করাতে হয়। ঘুষ দিয়ে কাজ না হলে শুধুমাত্র এফআইআর লেখানোর জন্যই অনেকসময় আদালতের সাহায্য নিতে হয়! একজন সাধারণ মহিলার পক্ষে এদেশের আইন-আদালতের নাগাল পাওয়া শুধু আর্থিক দিক থেকে নয়, সবদিক থেকেই ভীষণ কঠিন এই কাজ। অথচ অত ঝামেলা করে এফআইআর লেখালেই হারিয়ে যাওয়া মানুষটি ফিরে আসবেন তা নয়। তাই এফআইআর-এর জন্য বেশিরভাগ মানুষই আর আইন-আদালতের পথে যান না। এই কারণেই কাশ্মীরের হারিয়ে যাওয়া মানুষ এবং অর্ধেক-বিধবাদের সঠিক সংখ্যা কোনোদিনই পাওয়া সম্ভব নয়।

গ. তবু দু-চারজন যাঁরা আদালত পর্যন্ত যাওয়ার অধ্যবসায় দেখিয়েছেন তাঁরা বহুরকম হুমকির মুখোমুখি হয়েছেন। হুমকি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গিয়েও কোনো লাভ হয়নি। আইনের দীর্ঘসূত্রিতা তাঁদের হতাশাকে বাড়িয়েছে শুধু। দীর্ঘসূত্রিতার একটা প্রধান কারণ আগের অনুচ্ছেদে বলা ওই পাশবিক আইনগুলো। ওই আইনগুলো এক পোক্ত দেয়ালের আড়ালে সেনা-জওয়ানদের নিরাপদে রেখেছে। এদেশের আইন-আদালতের পক্ষে ওই দেয়াল ভাঙা প্রায় অসম্ভব এক কাজ। তাই অনেক লড়াই চালিয়েও, একসময় হতাশ হয়ে ওই অধ্যবসীয়রাও আইনের পথ থেকে সরে যান।— তা ছাড়া নিখোঁজের সন্ধান করতে প্রশাসনের প্রবল অনীহাও ওই অর্ধেক-বিধবাদের হতাশাকে আরো গভীর করেছে।

ঘ. হারিয়ে যাওয়া মানুষটির খবর জোগাড় করে দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে মাঝে মাঝেই ফড়ে বা দালালরা হাজির হয়। তখন কিছু অর্থ গচ্ছা যায়, কিন্তু কোনো খোঁজই পাওয়া যায় না। অনেকেই ছোটেন পীরবাবা অথবা জ্যোতিষের কাছে। সেখানেও কিছু খরচাপাতিই হয়— কোনো লাভ হয় না।

ঙ. ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যাবার পর পরই বড়ো হয়ে ওঠে রুটি-রুজির প্রশ্ন। কাশ্মীরের বেশিরভাগ পরিবারেরই আর্থিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ওইরকম শিল্পবিহীন, হতদরিদ্র এবং (প্রায়) যুদ্ধবিধস্ত অঞ্চলে কাজকর্ম পাওয়া খুবই মুশকিল। বেশিরভাগ পরিবারেই একজনের সামান্য রোজগারেই চলে ভরণপোষণ— সাধারণত পুরুষরাই রোজগার করেন। সামান্য রোজগারের কারণে সঞ্চয়ও বিশেষ হয় না। তাই হঠাৎই ওই রোজগেরে মানুষটি হারিয়ে গেলে পরিবারের মহিলাটি ছেলে-মেয়েসমেত আত্মীয়-পরিজনদের ঘাড়েই চাপতে বাধ্য হন। পরিজনেরা মানবিকতার খাতিরে কিছুদিন চালিয়ে দেন ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘদিন সে দায় পালন করার তাকত সবার থাকে না। ফলে সঙ্গী হারিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ওই অর্ধেক-বিধবাকে সংসারের আর্থিক জোয়াল কাঁধে নিতে হয়। সেই সংসারে নিজের ছেলে-মেয়েরা ছাড়াও থাকতে পারেন অশক্ত শ্বশুর-শাশুড়ি। বেশিরভাগই অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত এই মহিলাদের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত থাকে বড়োলোকদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ। ওইসব ‘ছোটো’ কাজে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের কারোরই কোনোরকম মানসিক প্রস্তুতি বা ইচ্ছে থাকে না। কিন্তু একসময় সব বাধা কাটিয়ে পরিচারিকা বা মজুরির মতো ‘ছোটো’ কাজে বাধ্য হয়েই যেতে হয়।

চ. ওইসব ‘ছোটো’ কাজের আয়ও খুব ছোটো। উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও চার-পাঁচজনের পরিবারে দু-বেলা পেট ভরানো মুশকিল হয়ে যায়, তখন বাধ্য হয়েই মা পরিবারের নাবালক সন্তানদেরও কাজে পাঠান। খোঁজখবর নিয়ে দেখা যাচ্ছে এইরকম পরিবারের বেশিরভাগ সন্তানেরই লেখাপড়া বা মানসিক বিকাশ ঠিকঠাক হয় না। এইরকম অসংখ্য শিশু-কিশোর-কিশোরী কাশ্মীরের হাজারো সংকটের আধুনিক এক সংযোজন।

ছ. সেনাবাহিনী বা জঙ্গিদের হাতে কেউ খুন হলে তাঁর স্ত্রী বা পরিজনদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার একটা আইনি সংস্থান রয়েছে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়ার জন্য কোনোরকম ক্ষতিপূরণ হয় না। তাই অনেকেই মনে করেন তাই অর্ধেক বৈধব্যের থেকে পুরো বৈধব্য বরং ভালো! কেননা, কোনো মহিলা উপযুক্ত দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে তাঁর স্বামীর মৃত্যুসংবাদ প্রমাণ করতে পারলে সরকারের কাছ থেকে কিছুটা আর্থিক সাহায্য পান। কিন্তু অর্ধেক-বিধবাদের হাতে প্রমাণের জন্য কোনো দলিলই থাকে না, ফলে তাঁরা সাধারণত কোনোরকম সরকারি সাহায্য পান না। কোনো ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়ার সাত বছর পর তাঁর স্ত্রী সরকারি সাহায্যের জন্য জেলাশাসকের কাছে আবেদন করতে পারেন। জেলাশাসক সেই আবেদন নির্দিষ্ট কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন। কমিটি ঠিক করে হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকে মৃত হিসেবে মেনে নেয়া হবে নাকি জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত বলে দেগে দেয়া হবে। কমিটি তৈরি হয় গোয়েন্দা, সেনা এবং পুলিশবাহিনীর লোকজনদের নিয়ে— হয়তো ওই লোকগুলোই বাড়ির বৈঠকখানা থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষটাকে তুলে নিয়ে গেছিল। স্বাভাবিকভাবেই সেই কমিটির ওপর ভরসা রাখা মুশকিল হয়। তবু বহু কাঠখড় পুড়িয়ে কিছু সাহায্য আদায় করা গেলে সেই টাকা পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়। কারণ, মুসলিম ব্যক্তিগত আইন মোতাবেক বেওয়ারিশ মানুষের স্ত্রী ওই টাকার আট ভাগের মাত্র এক ভাগ পাওয়ার অধিকারিণী! ফলে দীর্ঘ লড়াই-ঝঞ্ঝাটের পর অর্ধেক-বিধবাদের হাতে সামান্যই পড়ে থাকে!

জ. ঠিক একই কারণে বঞ্চিত হন হারিয়ে যাওয়া সরকারি কর্মচারিদের স্ত্রীরা। সরকারি আইন অনুসারে, কোনো কর্মী স্বেচ্ছায় বহুকাল কাজে হাজির না থাকলে বরখাস্ত হয়ে যান। তখন বরখাস্ত কর্মীর প্রাপ্য টাকাপয়সা, পেনশন তিনি বা তাঁর স্ত্রী-সন্তানেরা পেয়ে থাকেন। কিন্তু কোনো হারিয়ে যাওয়া মানুষকে স্বেচ্ছায় অনুপস্থিত বলে চিহ্নিত করা যায় না। ফলে তাঁর স্ত্রী-সন্তানেরা কোনোরকম আর্থিক সুবিধা আদায় করতে পারেন না। একইভাবে বঞ্চিত হন স্বামীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে জমা টাকা তুলতেও— কারণ অর্ধেক-বিধবাদের কাছে ব্যাঙ্ককে সন্তুষ্ট করার মতো কোনো নথি বা যুক্তি থাকে না।

ঝ. বেশিরভাগ অর্ধেক-বিধবাই শ্বশুরবাড়ি ছাড়তে বাধ্য হন। কারণ সহানুভূতির কাল কেটে যাবার পর, বাড়ির লোকজনেরা ওই দুর্ঘটনার জন্য মহিলার ভাগ্যকেই দায়ী করেন! যেন তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বলেই বাড়ির ছেলে হারিয়ে গেছেন! অনেকের মতে শ্বশুরবাড়ির ওই আচরণের পেছনে আসল কারণ হল সম্পত্তি। সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যই হারিয়ে যাওয়া ছেলের স্ত্রী-সন্তানদের নানারকম উৎপীড়ন করে তাড়িয়ে দেয়া হয়। তখন সম্ভব হলে কেউ কেউ বাপের বাড়িতে আশ্রয় পান। সেখানে সম্ভব না হলে পুরো পরিবারটাই বেওয়ারিশ হয়ে কে কোনদিকে ছিটকে যান কোনো খোঁজ থাকে না। অনেক মহিলাই শেষপর্যন্ত হারিয়ে যান দেহ ব্যবসায়ের আদিম চোরাগলিতে। শিশুদের জন্যেও খোলা থাকে অনেক কঠিন-কঠোর অন্ধকার আস্তানা।

ঞ. তবে অর্ধেক-বিধবাদের সবথেকে কঠিন কাজটি বোধহয় আবার বিয়ে করা। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে বা স্বামী

মারা গেলে আবার বিয়ে করা একটা সিধে রাস্তা। বিচ্ছেদ বা আকস্মিক মৃত্যু মেনে নেয়া কঠিন, কিন্তু তা একটি বাস্তব ঘটনা। মৃত্যু অনুভব করা যায়, মৃতদেহ দেখা যায়, ছোঁয়া যায়। তাই একজন বিধবা বা ডিভোর্সি মহিলার আবার বিয়ে করার শাস্ত্রীয় এবং আইনি সংস্থান রয়েছে। শোক বা মানসিক বাধা কাটিয়ে উঠতে পারলে জীবনের প্রয়োজনে তিনি আবার বিয়ে করতে পারেন। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া মানুষ জীবিত বা মৃত দুই-ই হতে পারেন— তাঁর অস্তিত্বই কুয়াশায় ঢাকা। তাই তাঁর সম্পর্কে শাস্ত্রে বা আইনে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। তাঁর সঙ্গিনীও অনিশ্চয়তার দ্বন্দ্বে ভোগেন। হারিয়ে যাওয়া মানুষটির ফেরার অপেক্ষায় সঙ্গিনী হয়তো বছরের পর বছর কাটিয়ে দেন। অপেক্ষা করতে করতে যুগ পেরিয়ে গেলেও তাঁকে মৃত বলে মেনে নিতে পারেন না। একসময় অপেক্ষার জোর কমতে থাকে, হয়তো টিকে থাকার জন্যই তিনি আরেক বার বিয়ের কথা ভাবেন। কিন্তু ভাবলেই সমাধান হয় না, বরং শুরু হয় সমস্যার। আগেই বলেছি, শাস্ত্রে বা আইনে এইরকম মহিলাদের পুনর্বিবাহ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। ইসলাম ধর্মের নিয়মকানুনে এই ব্যাপারে চার রকম ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে হানাফি ধারণা অনুসারে স্বামী অদৃশ্য হয়ে গেলে একজন মহিলা নব্বই বছর অপেক্ষার পর পুনর্বিবাহ করতে পারবেন! অবশ্য মালিকি ধারণা অনেকটা বাস্তববাদী। ওই মতের অনুসারীরা বলেন, পুনর্বিবাহের জন্য সাত বা চার বছর অপেক্ষাই যথেষ্ট। কাশ্মীরের সরকারি আইনেও এই সাত বছরকে মান্যতা দেয়া হয়েছে। সাত বছর অপেক্ষার পর স্থানীয় কাজীর কাছে আবেদন করলে প্রথম বিয়েটি বাতিল হয়ে যায় এবং আবেদনকারী আবার বিয়ে করতে পারেন।— পুনর্বিবাহের আরেকটি বাধা সন্তান এবং হারিয়ে যাওয়া স্বামীর পরিজন ও সমাজ। আমাদের মতো পিছিয়ে পড়া প্রায় সামন্তযুগীয় মানসিকতার দেশে পুনর্বিবাহ এখনও পুরোপুরি সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। পুরুষদের ব্যাপারে সমাজ একটু উদার কিন্তু মহিলাদের ব্যাপারে তার শতগুণ রক্ষণশীল। খুব সহানুভূতিশীল কাছের দু-চারজন মানুষ ছাড়া মহিলারা আর কারোর কাছ থেকেই এই কাজে আন্তরিক সমর্থন পান না। বাধা আসে স্বামীর পরিজনদের কাছ থেকেও। হারিয়ে-যাওয়া ছেলের মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় বা পরিবারের সম্মানহানির আশঙ্কায় তাঁর মা, বাবা বধূটিকে পুনর্বিবাহের অনুমতি দিতে চান না, অনেক পরিবার থেকেই সন্তানদের ছেড়ে যেতে হবে এই শর্ত চাপিয়ে দেয়া হয়। আবার, পুনর্বিবাহে রাজি হওয়া পুরুষটিও মহিলার আগের স্বামীর সন্তানদের স্বীকৃতি না দিতে পারেন। ফলে সন্তান এবং পুনর্বিবাহ এই উভয় সংকটে পড়ে অধিকাংশ সন্তানবতী মায়েদের আরেক বার বিয়ে করা সম্ভব হয় না।— সমাজ-গবেষকরা দেখিয়েছেন কাশ্মীরে মাত্র ৮/৯ শতাংশ অর্ধেক-বিধবা পুনর্বিবাহ করেন।

ট. এতসব অর্থনৈতিক এবং সামাজিক চাপে আধা-বিধবাদের নানারকম মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয়। অনিদ্রা, উৎকণ্ঠা, বিমর্ষতা তাঁদের খুব স্বাভাবিক পরিণতি। অধিকাংশ মহিলাই বিপর্যয়-পরবর্তী-মানসিক-ক্ষত (Post Traumatic Stress Disorder/PTSD) অসুখে ভোগেন। শ্রীনগরের সরকারি মানসিক রোগ হাসপাতালের আউটডোরে রোজ আড়াইশোর বেশি মানসিক রুগি আসেন। যাঁদের ৬০/৭০ শতাংশই মহিলা— অনেকেই অর্ধেক-বিধবা। অবশ্য এই মহিলাদের অধিকাংশই গ্রামে বাস করেন। তাঁরা মানসিক চিকিৎসার জন্য দূর শহরের হাসপাতালে যান না— ফলে সরকারি পরিসংখ্যানেও যুক্ত হন না! তাঁরা সহজলভ্য ওষুধ গ্রামের দোকান থেকেই কিনে খান, ফলে রোগের জটিলতা আরো বেড়ে যায়। মানসিক জটিলতা বাড়লে শারীরিক জটিলতাও বাড়ে। আর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে কাজকর্ম ঠিকভাবে করতে পারেন না, অর্থনৈতিকভাবে আরো তলিয়ে যান।

শুধু জঙ্গি বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়, হাজার হাজার মানুষের হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা কাশ্মীরে এক অতি জটিল আবর্ত তৈরি করেছে। যে আবর্তে ডুবে যাচ্ছে পারিবারিক সম্পর্ক, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সামাজিক আবেষ্টন। হারিয়ে যাওয়া মানুষটির পরিজনেরা এক অসহ্য পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটান। হারিয়ে যাওয়া মানুষটির কোনো খোঁজও পাওয়া যায় না, আবার তাঁকে মৃত বলেও মেনে নিতে পারেন না। মানুষগুলোকে হারিয়ে তাঁদের মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তানসন্ততি এবং অর্ধেক-বিধবারা আল্লাহ্‌র বিচারের ওপর ভরসা করে পার করে দিচ্ছেন অসম্পূর্ণ একটা জীবন।

আমরা মনে করি ওই পরিবারগুলো এবং অর্ধেক-বিধবাদের ভরসা জোগানোর দায়িত্ব প্রথমত, সরকারেরই নেয়া উচিত। সরকারের উচিত হারিয়ে যাওয়া ঘটনাগুলোর দ্রুত মীমাংসা করা। এক-দুজন নয়, শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে মানুষ কীভাবে, কোথায় হারিয়ে যাচ্ছেন সেই ধাঁধার উত্তর সরকারের পক্ষেই খোঁজা সম্ভব। পাশাপাশি সক্রিয় হতে হবে নাগরিক সমাজকে, সাধারণ মানুষকে। ঘরের মানুষকে হারিয়ে অধিকাংশই দরিদ্র পরিবারের এই মহিলারা এক নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব জীবন কাটান। একটা ঘটনায় তাঁদের সারাটা জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। মানুষের তৈরি এই আঘাতের বা আঘাত-উত্তর-মানসিক-ক্ষতের (PTSD) হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আপন-পর সকলকেই আন্তরিক উদ্যোগ নিতে হবে। অবশ্যই প্রধান উদ্যোগ নিতে হবে পরিবারের পরিজনদের। ওই দুর্ঘটনার

জন্য একজন মানুষকে দায়ী করে তাঁকে কোণঠাসা করা চলবে না, বরং তাঁর যন্ত্রণাটা অনুভব করতে হবে। ওই যন্ত্রণা কাছে-দূরের শুভবোধসম্পন্ন মানুষদের পক্ষেও অনুভব করা, ভাগ করে নেয়া সম্ভব। ওই মানুষগুলো প্রচলিত প্রশাসনিক এবং বিচার ব্যবস্থার মধ্যেও যাতে সুবিচার আদায় করতে পারেন তার জন্য সাধ্যমতো সচেতনা এবং আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণা মোতাবেক, কোনো দেশের কোনো মানুষ হারিয়ে যাওয়া সেই দেশের আইন অনুসারেই এক ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। কাগজে-কলমে ভারত সরকারও ওই ঘোষণার সমর্থক। কিন্তু কাশ্মীরের বাস্তব পরিস্থিতি অন্য কথা বলে। শুভবোধসম্পন্ন নাগরিক সমাজই সরকারকে রাষ্ট্রসংঘ বা নিজের ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য করতে পারে। আর তাহলেই বোধহয় কাশ্মীরের হাজারো আধা-বেওয়ার চোখের জলের অবিরাম ধারা কিছুটা কমবে।

সূত্র

১. হাফ উইডো, হাফ ওয়াইফ?/অ্যাসোসিয়েশন অব প্যারেন্টস্ অব ডিস্যাপিয়ার্ড পার্সনস্।

২. হাফ উইডোস্ ইন কাশ্মীর— এ স্টাডি অন ইমপ্যাক্ট অব পোস্ট ট্রমাটিক ডিসট্রেস ডিসঅর্ডার অন উওমেন; ড. আজরা আবিদি।

৩. হাফ অরফ্যানস অব কাশ্মীর ওয়েটিং ফর ফুলার লাইফ/হারুন মিরানি।

৪. ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ: ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৬/জম্মু-কাশ্মীর কোয়ালিশন অব সিভিল সোসাইটি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন অব প্যারেন্টস্ অব ডিস্যাপিয়ার্ড পার্সনস্।

৫. ইমপ্যাক্ট অব পোলিটিক্যাল, সোসিও-ইকোনমিক্ অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টরস্ অব হাফ ইউডোস্ ইন কাশ্মীর ভ্যালি/আব্দুল বসিত নায়িক।

৬. উওমেন অ্যান্ড আর্মড কনফ্লিক্ট: উইডোস ইন কাশ্মীর/ফারাহ্ কায়ুম।

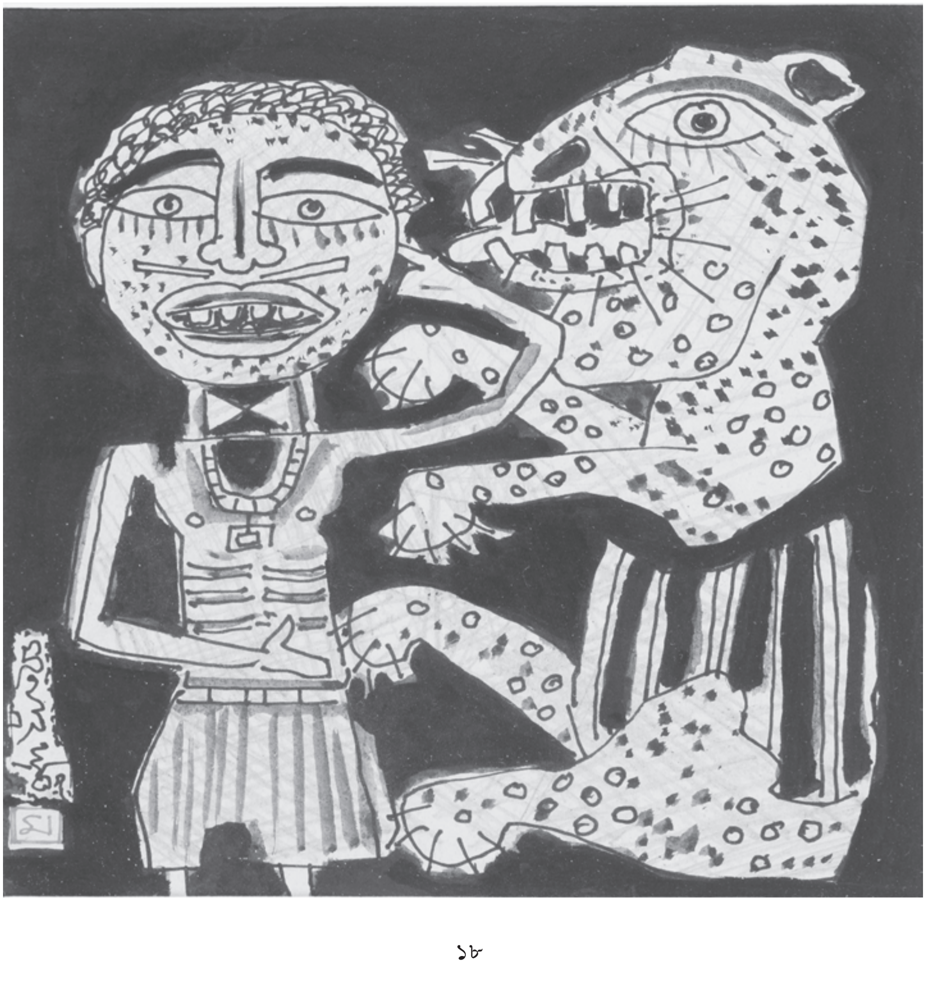

আতশকাচে মোদী সরকার

মোদী সরকারের পাঁচ বছর প্রায় অতিক্রান্ত। গত পাঁচ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর মুখে প্রচুর বড়ো বড়ো কথা শোনা গেছে। কিন্তু কাজের কাজ কতটা হয়েছে? পাঁচ বছর আগে নির্বাচনের প্রাক্কালে যে-সমস্ত গালভরা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, আজ তার কী পরিণতি হয়েছে? ভারতের অর্থ ব্যবস্থা এবং সমাজ বিগত পাঁচ বছরে কতটা পিছিয়েছে, 'আচ্ছে দিন'-এর খোয়াবের কী হল? এই প্রশ্নগুলির জবাব তালাশ করা হবে এই কলামে। ষষ্ঠ কিস্তির বিষয় 'কৃষি সংকট'।

কৃষকবিরোধী মোদী সরকার

ঈশান আনন্দ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সদ্য ঘোষণা করেছেন যে সরকারের কাজের জবাবদিহি চাওয়া বর্তমানে একটি 'ফ্যাশন' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বক্তব্য শুধু ক্ষমতার আস্ফালন নয়। এহেন উক্তির মধ্যে দিয়ে মোদী আসলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। আবার এই বক্তব্য মোদী সরকারের অপদার্থতার প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বহু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে, অনেক ঢক্কানিনাদ করে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু সরকারে আসার আগে তাদের দেওয়া প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ হয়েছে। এই বাস্তবতাকে স্বীকার করে, ত্রুটি সংশোধন না করে সরকার সত্যকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য মিথ্যে প্রচারের আশ্রয় নিচ্ছে।

মোদী সরকারের বহুবিধ ব্যর্থতার মধ্যে কৃষি ক্ষেত্রে তাদের নানান কু-কীর্তি এবং অপদার্থতা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। বিগত দুই দশক ধরে দেশের কৃষি ক্ষেত্র— যার উপর ভারতের বৃহদাংশের মানুষের জীবিকা নির্ভরশীল— গভীর সংকটে নিমগ্ন থেকেছে। মোদী সরকারের আমলে এই কৃষি সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের ভ্রান্ত নীতি ও বাজেট বরাদ্দ ছাঁটাই এই সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করেছে।

ক্ষমতায় আসার পরে মোদী ঘোষণা করেন যে ২০২২ সালের মধ্যে দেশের কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়ে যাবে। যদিও মোদী সরকারের সময়সীমা শেষ হওয়ার মুখে, তারা এখনও অবধি ঘোষণা করেনি যে এই লক্ষ্যের থেকে তারা কতটা দূরে রয়েছে। এর কারণ হল এই যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার জায়গায় বর্তমান সরকারের আমলে কৃষি ক্ষেত্রের আয় সাম্প্রতিক অতীতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রের আয় বৃদ্ধির হার ২০১৮-১৯ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৮) ২.০৪ শতাংশে এসে ঠেকেছে, যা ২০০৪-০৫ সালের পরে সর্বনিম্ন।

কৃষি ক্ষেত্রে এই ভয়াবহ স্থবিরতার নেপথ্যে প্রধান কারণ হল কৃষি পণ্যের মূল্য। পাইকারি মূল্যকে যদিও কৃষি আয়ের সূচক হিসেবে দেখা যেতে পারে, মনে রাখতে হবে যে কৃষকরা ফসলের জন্য যেই দাম পান, তা পাইকারি মূল্যের থেকেও অনেক কম। মোদী সরকারের আমলে খাদ্য পণ্যের পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে খাদ্যপণ্যের পাইকারি মূল্যবৃদ্ধির হার ঋণাত্মক থেকেছে, যার মানে হল এই যে কৃষকের ফসলের দাম লাগাতার কমেছে। ফসলের এই মূল্য হ্রাস বিগত ১৮ বছরের মধ্যে সর্বাধিক হয়েছে। একদিকে, ফসলের দাম কমেছে, অন্যদিকে চাষের উপকরণের খরচ বেড়েছে, যার ফলে কৃষি ক্ষেত্রের বিনিময় মূল্য কমেছে। ফসলের লাগাতার পতনশীল দামের প্রধান কারণ মোদী সরকারের বাণিজ্য সংক্রান্ত ভ্রান্ত নীতি এবং গ্রামীণ ভারতে চাহিদা হ্রাস পাওয়া। একদিকে, কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না। অন্যদিকে কায়িক শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার কমতে থাকার ফলে ভূমিহীন কৃষকদের আয়ও বাড়েনি। ২০১০ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে গ্রামীণ প্রকৃত মজুরি যেখানে বার্ষিক ২০ শতাংশ হারে বাড়ছিল, মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পরে এই বৃদ্ধির হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আবার কৃষিকাজ ছেড়ে অকৃষি কাজে ভদ্রস্থ চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও বিশ বাঁও জলে। তথ্য বলছে, বিগত ৪৫ বছরে দেশের বেকারত্বের হার সর্বাধিক হয়েছে ২০১৭-১৮ সালে।

নব-উদারবাদী নীতি সমূহকে আগ্রাসীভাবে লাগু করা এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষ কৃষি ক্ষেত্রের এই সংকটের জন্য

সরাসরি দায়ী। মোদী সরকারের প্রথম দুই বছরে কৃষি ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ ব্যাপকভাবে ছাঁটাই করা হয় এমন এক সময়ে যখন লাগাতার দুই বছর দেশের গরিব কৃষক খরার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। ২০১৬ সালে যথেষ্ট পরিমাণ বর্ষা হওয়ার ফলে আগের বছরগুলির তুলনায় কৃষি ক্ষেত্রের কিছু উন্নতি হচ্ছিল। কিন্তু নোট বাতিলের মতন পাগলের নীতি নেওয়ার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। যেহেতু গ্রামীণ এবং অসংগঠিত অর্থ ব্যবস্থা প্রধানত নগদ-নির্ভর, তাই নোট বাতিলের দরুণ আমাদের দেশের কৃষকেরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট কত জমিতে বীজ রোপণ করা হয়েছে বা কত ফসল উৎপন্ন হয়েছে, তার উপরে নোট বাতিলের প্রভাব অতটা পড়েনি। কিন্তু নোট বাতিলের ফলে ফসলের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। কৃষকরা জলের দরে তাঁদের ফসল বেচে প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করেন। কৃষকদের জন্য ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ না করতে পারা মোদী সরকারের যাবতীয় ব্যর্থতার মধ্যে উপরের সারিতেই রাখতে হবে।

'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'-এর পরিবর্তে, বিজেপি তথা সংঘ পরিবারের সদস্যরা গো-রক্ষার নামে মুসলমান ও দলিত সমাজের মানুষের উপরে ব্যাপক আক্রমণ নামিয়ে আনে। আবার কেন্দ্রীয় সরকার গোরু রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। একদিকে, সংঘ পরিবারের তাণ্ডবের জন্য প্রচুর নিরপরাধ মানুষের প্রাণ যায়। আবার, গোরুকে কেন্দ্র করে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি এবং সরকারি নীতি গ্রামের অর্থ ব্যবস্থার ক্ষতি করেছে। দুধ দেওয়ার বয়স পেরিয়ে গেলে, গোরু বয়স্ক হয়ে গেলে তাকে বাড়িতে রাখলে চাষির ক্ষতি। আগে চাষিরা এই গোরুগুলি বিক্রি করে দিত। এখন তা সম্ভব হচ্ছে না। আবার গোরুগুলিকে রাখাও সম্ভব নয়। তাই তারা গোরুগুলিকে বেওয়ারিশভাবে ছেড়ে দিচ্ছে। এই গোরুগুলি গ্রামাঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করছে। তারা খেতের ফসল খেয়ে ফেলছে, আনাজ নষ্ট করে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজ্যে কৃষকদের রাত জেগে খেত পাহারা দিতে হচ্ছে যাতে গোরু এসে ফসল না খেয়ে নেয়। হিন্দুত্বের নামে গো-রক্ষার জিগির তুলে বিজেপি কৃষকদের বড়ো ক্ষতি করে দিয়েছে।

মোদী সরকারের কৃষি সংক্রান্ত বিবিধ প্রকল্প ও ঘোষণার দিকে এবারে দৃষ্টিপাত করা যাক। কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছিল যে তাদের আমলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধি ইতিহাস রচনা করেছে। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বৃদ্ধির হার বিগত সরকারগুলির আমলে মোদী সরকারের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। দ্বিতীয়ত ফসল কেনার ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাজ্যে সরকারি অনীহার জন্য বর্ধিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের সুবিধা সিংহভাগ কৃষক, বিশেষ করে ছোটো চাষিরা, পায়নি। মোদী সরকার দাবি করেছে যে তারা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করেছে কৃষি খরচের ৫০ শতাংশ বেশি হারে। এই কথাটিও মিথ্যা প্রচার ছাড়া কিছুই নয়। তারা কৃষি ক্ষেত্রের খরচ এমন এক পদ্ধতিতে মেপেছে যার ফলে এই খরচ কম করে দেখানো হয়েছে। স্বামীনাথন কমিটির প্রস্তাব সমূহ তারা লাগু করেনি। আবার আগের আমলের সরকারি কৃষি বিমা প্রকল্পকেই তারা নতুন নামকরণ করে, প্রধানমন্ত্রী কৃষি ফসল বিমা যোজনার সাফল্যের প্রচার চালাচ্ছে। এই কথাটিও মিথ্যা কারণ ফসল নষ্ট হওয়ার পরে কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পাননি, কিন্তু বিমা কোম্পানিগুলি প্রিমিয়ামের টাকা বাড়িয়ে বিপুল মুনাফা কামিয়েছে। এই প্রকল্পের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ২০১৭-১৮ সালে ৯০ লক্ষ কৃষক প্রধানমন্ত্রী কৃষি ফসল বিমা যোজনার থেকে বেরিয়ে গেছেন।

সদ্য ঘোষিত বাজেটে, মোদী সরকার কৃষকদের মন জয় করার চেষ্টা করার জন্য সমস্ত রীতিনীতি ভেঙে অর্ন্তবর্তী বাজেটে বড়ো বড়ো প্রকল্পের ঘোষণা করেছে। বিশেষ করে তারা ঘোষণা করেছে যেই সমস্ত কৃষকের জমির পরিমাণ দুই হেক্টরের কম তাদের প্রত্যেককে সরকারি কোষাগার থেকে বার্ষিক ৬০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হবে। ৬০০০ টাকা বার্ষিক হারে ৫ সদস্যের কৃষক পরিবার পেলে তা দৈনিক মাথাপিছু ৩ টাকা ৩৩ পয়সা হয়— যেই পরিমাণকে যৎসামান্য বললেও কম বলা হয়। এক হেক্টর জমিতে শুধু ধান ফলাতে গড়ে খরচ হয় ৭০০০০ টাকা। একাধিক ফসল ফলালে তার খরচ পড়বে কয়েক লক্ষ টাকা। সেখানে মাত্র বার্ষিক ৬০০০ টাকা যে কৃষকদের কোনো সমস্যার সমাধান করবে না, এই কথা শিশুও বোঝে। তদুপরি, এই প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকবেন বহু মানুষ যারা কৃষিজীবী কিন্তু যাদের জমির মালিকানা নেই। যেমন খেতমজুর, ঠিকা শ্রমিক, যারা কৃষি ক্ষেত্রে কোমর ভাঙা পরিশ্রম করেন, তারা এই প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকবেন। আবার শুষ্ক অঞ্চলে দেখা যায় যে কৃষকদের জমির পরিমাণ বেশি যেহেতু সেই জমির উৎপাদনশীলতা অনেক কম। কিন্তু এইসব অঞ্চলে কৃষকদের জমির পরিমাণ ২ হেক্টরের বেশি হলে তারাও এই প্রকল্পের বাইরে থাকবে। অর্থাৎ, সেচযুক্ত জমি ও শুষ্ক জমির মধ্যে কোনো ফারাক করা হচ্ছে না, যা ভারতের মতন দেশে একটি ভ্রান্ত নীতি। বিগত ছয়টি বাজেটে কৃষকদের কৃষি ঋণ মকুবের ব্যাপারে সরকার নীরব থেকেছে যেখানে কর্পোরেটদের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ লাগাতার বেড়েছে। এই বাজেটে সরকার ১০০ দিনের কাজের বরাদ্দ ছাঁটাই করেছে ১০০০ কোটি টাকা।

নিজেদের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য বিজেপি সরকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ছাপা বন্ধ করে দিয়েছে। যেমন ২০১৫ সালের পরে দেশে

কৃষক আত্মহত্যার কোনো সরকারি তথ্য প্রকাশিত হয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সাধারণ পারিবারিক উৎস নিয়ে বিজেপি লাগাতার প্রচার চালিয়েছে। কিন্তু মোদী সরকারকে ইতিহাস মনে রাখবে এমন সব নীতির জন্য তা কোটি কোটি মানুষকে আরো বেশি দারিদ্র্য ও আর্থিক কষ্টের দিকে ঠেলে দিয়েছে। নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' নয়; ইতিহাস মনে রাখবে মোদীকে অন্যের 'মন কি বাত' দাবিয়ে দেওয়ার জন্য, কৃষকদের 'মন কি বাত' না শোনার জন্য। কৃষক আন্দোলনকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে তাও ইতিহাসে লেখা থাকবে।

এই সরকারের আমলের তমসাচ্ছন্ন আকাশে আলোর কিরণ দেখিয়েছে দেশজুড়ে কৃষকদের আন্দোলন ও লং মার্চ। ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে যে দেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে গিয়ে কোনো রাজনৈতিক শক্তি ক্ষমতায় ফিরতে পারেনি। কৃষকবিরোধী মোদী সরকার ইতিহাসের এই নিয়মের ব্যতিক্রম হবে না, এই আশা অমূলক নয়।

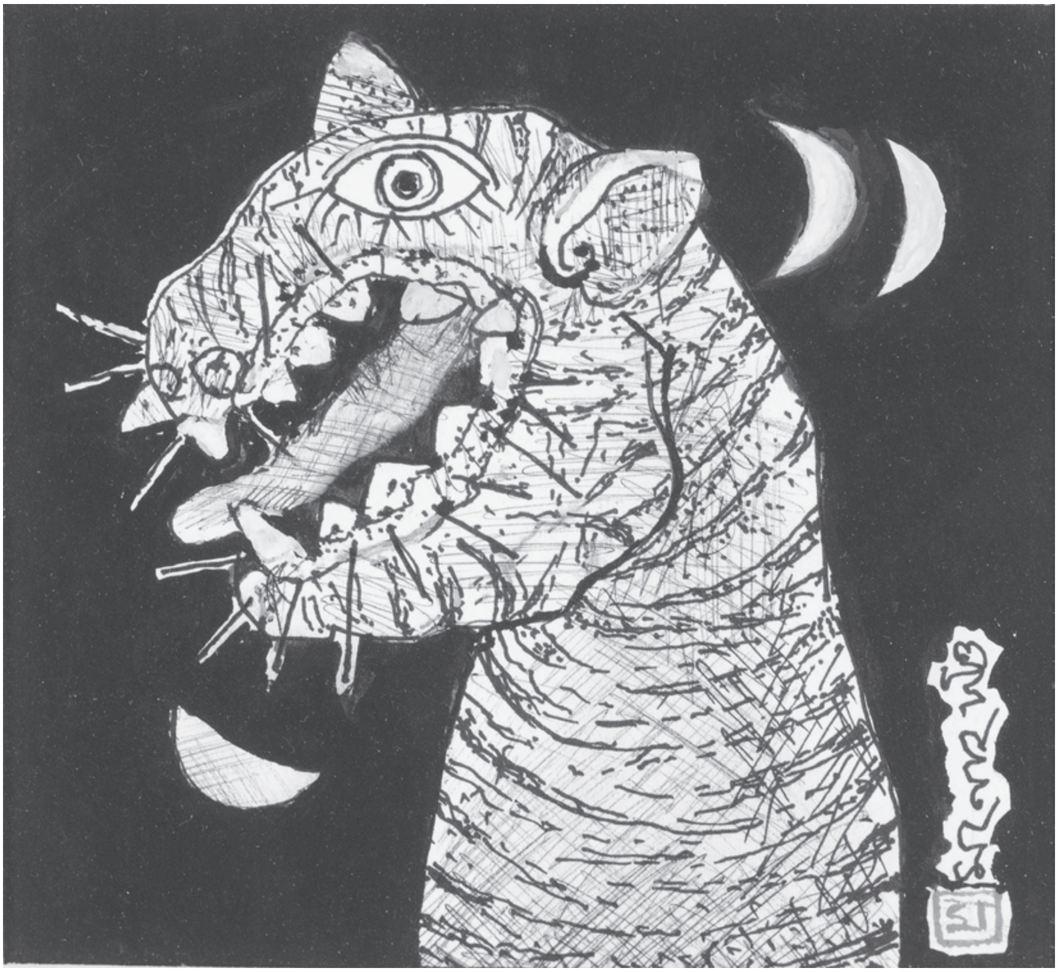

আন্তর্জাতিকতাবাদী থেকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভারত

দেবর্ষি চক্রবর্তী

দেবজিৎ ঠাকুর

বুদাপেস্ট শহরে দানিয়ুব নদীর তীরে একটি পার্ক রয়েছে। নাম নেহরু পার্ক। ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর নামাঙ্কিত এই পার্ক আজও কেউ বুদাপেস্ট শহরে গেলে দেখতে পাবেন। ১৯৫৬ সালে যখন হাঙ্গেরিতে সোভিয়েত আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয় তখন ভারতবর্ষ ছিল প্রথম গুটিকয়েক দেশের মধ্যে একটি যারা হাঙ্গেরিতে সোভিয়েতের সেনা পাঠানোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং তারপরে সোভিয়েত এবং বিদ্রোহী হাঙ্গেরীয়দের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাও পালন করে। হাঙ্গেরির ঘটনা যখন ঘটছে তখন অন্যদিকে গোটা দুনিয়া উত্তাল সুয়েজ সংকটকে ঘিরে। ভারতবর্ষ সুয়েজ সংকট শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই মিশরের উপর পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলির আক্রমণের কড়া নিন্দা করে কিন্তু হাঙ্গেরির বিষয়ে নেহরু সরকারের পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত সতর্ক। নেহরু সরকার যখন সন্তর্পণে এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত হয় যে এটি কোনো ফ্যাসিস্ট উত্থান নয় বরং এই বিদ্রোহের মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত 'জাতীয় চরিত্র' আছে তখন তারা সোভিয়েত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এবং সেখানেই থেমে না থেকে তারা জাতিসংঘের হস্তক্ষেপও দাবি করে। যদিও সেই হাঙ্গেরি বিদ্রোহের প্রাক্কালে নেহরুর তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মহাম্মদ আতাউর রহমান, যিনি তৎকালীন ভারতীয় রাজদূত ছিলেন বুদাপেস্টে। তিনি এবং মস্কোতে অবস্থিত ভারতীয় রাজদূত কেপিএস মেনন সোভিয়েত এবং হাঙ্গেরির বিদ্রোহীদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করতে থাকেন, সঙ্গেসঙ্গে এটাও নিশ্চিত করেন যে যাতে বিদ্রোহীরা কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হন। পরবর্তীকালে সোভিয়েত-উত্তর হাঙ্গেরির প্রথম প্রেসিডেন্ট হন যে আর্পাদ গনজ, যিনি ৫৬-র বিদ্রোহের অন্যতম সৈনিক ছিলেন, তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন তিনি বলেন, '১৯৫৬ সালে ভারতীয় দূতাবাস বিপ্লবের দূতাবাস হয়ে উঠেছিল।'

স্বাধীন ভারতের এই বৈদেশিক নীতি জওহরলাল নেহরুর একার কোনো কৃতিত্ব নয়। আমরা যদি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব কীভাবে সেই ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে আন্তর্জাতিক সংহতির উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। যে দুজনের কথা প্রথমেই বলা যেতে পারে— গোপাল হুদ্দুর এবং ড. দ্বারকানাথ কোটনিশ। গোপাল হুদ্দুর তার প্রথম জীবনে মহারাষ্ট্রে থাকাকালীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য ছিলেন। তারপরে তিনি ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে চলে যান এবং সেখানে কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে আসেন। স্পেনে যখন রিপাবলিকান এবং ফ্যাসিস্টদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি রিপাবলিকানদের হয়ে লড়াই করতে যান। ১৯৩৬ সালে ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তাঁকে কারাবাস করতে হয়। স্পেন থেকে তিনি যখন ভারতবর্ষ ফেরেন ১৯৩৮ সালে, তখন তার ভারতে পদার্পণের মুহূর্তে বোম্বে শহরের ট্রেড ইউনিয়নসমূহ একটি সংবর্ধনার আয়োজন করে। সেই সংবর্ধনা সভায় তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'ভারতবর্ষ এবং স্পেনের সংগ্রামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। স্পেনকে ধ্বংস করতে মুসোলিনি এবং ফ্রাঙ্কোকে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই সাহায্য করছে যারা ভারতবর্ষকে শোষণ করছে। স্পেনের মতোই এখানে শ্রমিক, কৃষক এবং মধ্যবিত্ত জনতার মধ্যে ব্যাপক ঐক্য গড়ে তুলে এই সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।' হুদ্দার পরবর্তী সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং তার সংগ্রাম চালিয়ে যান।

অন্যদিকে, দ্বারকানাথ কোটনিস সম্ভবত আন্তর্জাতিক সংহতির বিষয়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে। চিনে জাপানি আক্রমণের সময়ে যে মেডিকেল টিম চিনা প্রতিরোধ বাহিনীকে সহায়তা করতে যায়, ডা. কোটনিস সেই দলের সদস্য ছিলেন। পাঁচ জনের এই দলের বাকিরা ফিরে এলেও কোটনিস এবং তার এক সহকর্মী থেকে যান এবং তাঁরা এই জাপানি আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষায় কয়েক হাজার সৈনিকের প্রাণরক্ষা করেন। কোটনিস ও তার চৈনিক স্ত্রী তাদের সন্তানের নাম রাখেন ইনহুয়া (ইন-ভারত, হুয়া-চিন)। কোটনিস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তার এই মহৎ আত্মবলিদানের কাজ জারি

রাখেন, এবং তিনি মারা যাওয়ার পর, মাও-সে-তুং তাঁর শোকবার্তায় লেখেন, '...আমাদের জাতি তাঁর এক পরম বন্ধুকে হারাল আজ।' নেহরু 'হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই' এই স্লোগান দেওয়ার বহু আগেই কেদিহুয়া (ড. কোটনিসকে চিনারা ভালোবেসে যে নামে ডাকতেন) তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে দুই দেশের মেহনতি মানুষের হৃদয়ের ঐক্য স্থাপন করে গেছিলেন। যখন একদিকে কোটনিস জীবন বাজি রেখে চিনের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তখন সাভারকর বোম্বে শহরে লিফলেট বিলোচ্ছিলেন চিনে জাপানের নৃশংস নানকিং গণহত্যার সপক্ষে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, সাভারকরদের এই ফ্যাসিস্ট প্রচার ভারতের সংগ্রামী জনমানসে বিন্দুমাত্র দাগ কাটাতে পারেনি। কোটনিস, হুদ্দার, মানবেন্দ্র রায়রা ভারতের জনগণের মধ্যে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির যে ধারার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তা স্বাধীনতার পরেও বহমান থেকে যায়।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই আন্তর্জাতিক সংহতির ধারা ভারত খাতায়-কলমে স্বাধীনতা পাওয়ার আগে থেকেই তার বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করা শুরু করে। যখন ব্রিটিশ সরকারের হুকুমে ভারতের সেনাবাহিনী ১৯৪৬ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ডাচদের উপনিবেশ পুনরুদ্ধার করতে ব্যস্ত, তখন ভারতের অন্তবর্তীকালীন সরকারের প্রধান হিসেবে নেহরু তাঁর সংহতি জানান ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের প্রতি। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার ঠিক পর পরই ভারতবর্ষ দিল্লিতে এশিয়ান রিলেশনস কনফারেন্সের আয়োজন করে, যাকে ১৯৫৫ বান্দুং কনফারেন্স বা তৎপরবর্তীতে নির্জোট আন্দোলনের পূর্বসুরি বলা যেতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল, যখন পশ্চিমি দেশগুলিতে জল্পনা চলছে যে আদৌ ভারত যুক্তরাষ্ট্র টিকবে কিনা কিংবা ভারতবর্ষের কোনো গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ আছে কিনা সেই বিষয়ে, তখন ভারত শুধু একটি জোরালো গণতান্ত্রিক কাঠামোই গড়ে তুলছিল তাই নয়, তাঁর সঙ্গেসঙ্গে একটি নির্ভীক এবং স্বাধীনচেতা পররাষ্ট্র সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিও গ্রহণ করেছিল। কোটি কোটি অনাহারক্লিষ্ট, অশিক্ষিত জনগণের দেশ হয়েও কীভাবে ভারতবর্ষ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন সংগ্রামে প্রগতিশীল এবং গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করল, প্রয়োজনে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করল, তা আজও অনেকের কাছেই বিস্ময়ের। ১৯৪৯ সালে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে সোভিয়েত ব্লকের বাইরে প্রথম দেশ হিসেবে চিনকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ভারতবর্ষ। সেখআনেই ভারত থেমে থাকেনি, এরপর যখন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তাইওয়ানকে সরিয়ে জনগণতান্ত্রিক চিনকে স্থান দেওয়ার প্রশ্ন আসে তখন পশ্চিমি দেশগুলির অন্যায় টালবাহানার বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার হয় সেই ভারতবর্ষই। কোরীয় যুদ্ধের সময়ে ভারতের উত্থাপন করা প্রস্তাবনা জাতিসংঘে বিনা বাধায় গৃহীত হয়। তারপর ভারতের নেতৃত্বেই জাতিসংঘের 'নিউট্রাল নেশনস রিপার্টেরাশান কমিশন' কোরীয় যুদ্ধের মধ্যস্থতাকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করে এবং দুই পক্ষের প্রায় কুড়ি হাজার যুদ্ধবন্দির শান্তিপূর্ণ প্রত্যার্পণের বিষয়টি দেখভাল করে। এরপরে ১৯৫৬ সালে যখন সুয়েজ সংকট এবং হাঙ্গেরির বিদ্রোহ প্রায় একইসময়ে ঘটে তখনই ভারতবর্ষের জোটনিরপেক্ষ নীতির সামনে সবথেকে বড়ো চ্যালেঞ্জ আসে, যা ভারত তাঁর পররাষ্ট্রনীতির আদর্শগত অবস্থান থেকে একবিন্দুও না সরে সামাল দেয়— দুই ক্ষেত্রেই যারা আক্রমণকারী তাদের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান গ্রহণ করে।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। ৭১-এর মার্চে মুজিবর রহমান পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার সঙ্গেসঙ্গেই ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। যে অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে, যার ফলে প্রায় এক কোটি মানুষ উদ্‌বাস্তু হয়ে ভারতবর্ষে চলে আসতে বাধ্য হন ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ভারত সরকার একদিকে যেমন তার সীমানা উন্মুক্ত করে উদ্‌বাস্তুদের এপারে ঠাঁই দেয় তেমনি তারা বিভিন্ন দেশের সামনে, জাতিসংঘের সামনে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে। হাজার প্ররোচনা সত্ত্বেও, প্রাথমিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনী না পাঠিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান সংকটকে একটি আন্তর্জাতিক সংকটের রূপ ধারণ করতে দেয়, এটিকে ভারত পাকিস্তানের কোনো দ্বিপাক্ষিক বিষয় (কাশ্মীরের ক্ষেত্রে যেটি ১৯৪৮ সালে হয়ে পড়ে) হতে দেয়নি। কোনো তৃতীয় শক্তি আক্রমণ করতে পারবে না এটা সুনিশ্চিত করে এবং পাকিস্তানকে ভারতের উপর প্রথম আঘাত হানতে দিয়ে ভারত সরকার গোটা আন্তর্জাতিক দুনিয়ার সামনে পাকিস্তানকে আক্রমণকারী হিসেবে প্রতিপন্ন করে এবং তারপরেই পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনী পাঠায়। শেষপর্যন্ত মাত্র ১৫ দিনের লড়াইয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় মুক্তিবাহিনী ঢাকা দখলে সফল হয়। জন্ম নেয় স্বাধীন বাংলাদেশ।

এই প্রত্যেকটি ঘটনাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-উত্তর বৈদেশিক নীতির অত্যন্ত সম্মানজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই বৈদেশিক নীতি কোনো ব্যক্তি বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মস্তিষ্কপ্রসূত নয়। এই নীতি একইসঙ্গে সামরিক শক্তি নির্ভরও নয়, কারণ ভারত রাষ্ট্র সেইসময়ে কোনো বড়ো সামরিক শক্তিই হয়ে ওঠেনি— তার কাছে না ছিল সুবিশাল সেনাদল, না ছিল পারমাণবিক অস্ত্র, না ছিল উন্নত সামরিক প্রযুক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ঐতিহ্য, অহিংসার প্রতি যে অঙ্গীকার, সেখান থেকে যে জাতীয় আদর্শ প্রস্তুত হয়েছিল তা কোটি কোটি 'অশিক্ষিত' জনগণের মধ্যেও সুবিশাল আদর্শনৈতিক ছাপ ফেলে। এই আদর্শ শুধুমাত্র ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও

যেখানে যেখানে অনাচার, অবিচার, অত্যাচার দেখা গেছে, তার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সাধারণ জনগণকে উদ্‌বেলিত করেছে, তাকে বাধ্য করেছে প্রতিবাদ করতে। ১৯৬০-এর উত্তাল দশকে ভারতবর্ষের রাজপথ বার বার করে সাক্ষী থেকেছে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুবদের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের। কিংবা প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে যে জনমত গড়ে উঠেছিল ভারতে সেই সময়ে, সেটিও লক্ষণীয়। এই রাজপথের সংগ্রামগুলি ভারত সরকারের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভারত সরকার ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নেয় এবং বরাবর ইজরায়েল প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে দুই-রাষ্ট্র নীতিকে মান্যতা দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আজকে এই বিষয়গুলিকে নিয়ে কথা বলা কেন প্রয়োজন? প্রয়োজন কারণ, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মোদী সরকার যা করছে, সেটিকে বাদ দিলেও পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে যা করেছে, সেটি তুলনাহীনভাবে আমাদের দেশকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছে। অভূতপূর্বভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নেপাল এবং শ্রীলঙ্কার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেভাবে নাক গলিয়েছে, দাদাগিরি ফলিয়েছে তাতে ভারতবর্ষের দুই স্বাভাবিক মিত্র দেশই আজ চিনের দিকে সরে গেছে। অন্যদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে মুখ্যত সামরিক আদানপ্রদান বাড়িয়ে যে সখ্য তৈরি করেছে ভারত তাতে ইজরায়েল-প্যালেস্টাইনের ক্ষেত্রে নিয়ে চলা দুই-রাষ্ট্রনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধুমাত্র তাই নয়, মোদী ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান যিনি ইজরায়েল পরিদর্শনে গিয়ে প্যালেস্টাইন না গিয়ে ফিরে এসেছেন— বার্তা স্পষ্ট যে ভারত আর প্যালেস্টাইনের মুক্তি-সংগ্রামকে সমর্থন করে না।

একইসঙ্গে বিপজ্জনকভাবে ভারত আমেরিকার দিকে ঢলে পড়েছে পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপানের সঙ্গে ইন্দো-প্যাসিফিক চুক্তি স্বাক্ষর করে, নির্লজ্জভাবে এই সরকার জোট-নিরপেক্ষ নীতিকে লঙ্ঘন করেছে। শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে আমেরিকা-চিনের বিবাদে ভারত দক্ষিণ এশিয়াতে আমেরিকার বোড়েতে পরিণত হয়েছে, ফলে একদিকে উত্তপ্ত হচ্ছে চিনের সঙ্গে চলতে থাকা সীমান্ত বিবাদ, অন্যদিকে চিন আরো বেশি বেশি করে পাকিস্তানের দিকে সরে যাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলে, যেখানে পাশাপাশি তিনটি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ রয়েছে, সেখানে এই বিপজ্জনক বৈদেশিক নীতি হারাকিরির শামিল।

পুলওমার ঘটনার পরে যেখানে সমগ্র পৃথিবী ভারতবর্ষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে ভারত সরকার সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তানের উপর সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি না করে পাকিস্তানে গিয়ে বোমাবর্ষণ করে এল। এই বোমাবর্ষণে আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাগুলির খবর অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদী আখড়াগুলোর কোনো ক্ষতি না হলেও, গোটা দুনিয়ার সামনে ভারত আজ আগ্রাসনকারী হিসেবে পরিচিত হল। শুধু তাই নয়, এই বোমাবর্ষণের পরের ঘটনাবলি আরো লজ্জাজনক, যখন ভারতের বিমানবাহিনীর এক পাইলট পাকিস্তানে ধরা পড়লেন, তারপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বার বার করে শান্তির বার্তা দিলেন, এমনকী সেই পাইলটকে ছেড়েও দিলেন, তাতে দেশের মাথা আরো নত হল, কারণ যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শান্তি প্রস্তাব দিচ্ছেন তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী, শাসকদলের নেতারা দেশজুড়ে যুদ্ধজিগির তুলছেন আর তাতে যোগ্য সঙ্গত করছে দেশের বিক্রি হয়ে যাওয়া মিডিয়া।

এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে প্রশ্ন করলেই দেশদ্রোহী হিসেবে দেগে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন উঠছে। সত্যিই কি এই বিমান হানার ফলে জঙ্গি হামলা তথা পাকিস্তানের জঙ্গি মদতের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব? বিশেষজ্ঞদের একটি অংশ জানাচ্ছেন যে বিমান হানার মাধ্যমে জঙ্গি আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব নয়। আবার ভারতের বিমানহানার পরের দিন পাকিস্তান ভারতের সীমানা উল্লঙ্ঘন করে বোমা বর্ষণ করে প্রমাণ করেছে যে তারাও প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত। পরমাণু শক্তিধর দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ এক ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনবে দুই দেশ তথা গোটা দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জন্য। তাই বিমান হানা বা যুদ্ধ করে কোনো সমাধান সম্ভব না। তাই দুই দেশকেই আলোচনার টেবিলে বসতেই হবে। সন্ত্রাসবাদ, পাকিস্তানের ভূমিকা, কাশ্মীর, সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। আন্তর্জাতিক মহলে চাপ তৈরি করতে হবে পাকিস্তানের উপর যাতে তারা সন্ত্রাসবাদীদের মদত দেওয়া বন্ধ করে।

অন্যদিকে, কাশ্মীরে ২০১৬ সাল থেকে বিজেপি সরকার যে প্রকট অত্যাচারের নীতি নিয়ে চলছে তাকে নিন্দা করতে বাধ্য হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, এমনকী জাতিসংঘও। আজকে আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে কাশ্মীরে ভারত রাষ্ট্রের ভূমিকাকে প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের পাশবিক ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। কাশ্মীরের সমস্যার কোনো সামরিক সমাধান হতে পারে না। এখানেও আবারও রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে হবে। কিন্তু বিজেপি-র উগ্র-হিন্দুত্ববাদ এবং মুসলমান বিদ্বেষ এই পথে হাঁটতে রাজি নয়। তারা মনে করছে সেনাবাহিনীর মদতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্ভব। সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা বার বার রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেছেন কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা!

পরিতাপের বিষয়, এই একদেশদর্শী, আগ্রাসী এবং সামরিকশক্তি-নির্ভর জাতীয়তাবাদ ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র বিষয়ক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল, যা আমাদের গৌরবোজ্জল স্বাধীনতা পরবর্তী পররাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। স্বাধীনতা-উত্তর বৈদেশিক নীতিও আগ্রাসী ছিল, সাহসী ছিল, কিন্তু সেই আগ্রাসন ছিল বিউপনিবেশিকরণ, ন্যায় এবং বিশ্বশান্তির পক্ষে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

নির্বাচনের যুদ্ধ— নির্বাচিত 'যুদ্ধ': প্রসঙ্গ কাশ্মীর

ইমানুল হক

'আমরা তাই বিশ্বাস করি, যা করতে আমাদের মন চায়'! এই বিশ্বাস বিষয়টা বড়ো গোলমেলে। যুক্তি তর্ক বুদ্ধি বিবেকের ধার ধারে না। অন্ধ ভাবাবেগ, টিন এজ মার্কা চাপল্য বস্তু ও বিষয়ের দ্বান্দ্বিকতা ভুলে একমাত্রিক ও একরৈখিক হয়ে যায়। ফলে, তাকে কাজে লাগানোর সুযোগ পায় ক্ষমতা ও শাসক মতাদর্শ। যুক্তি ও তথ্য নির্ভরতা দাবি করছে সময়। দেশ। জাতি।

২০১৮-র এপ্রিলে উত্তরপ্রদেশের বিধায়ক সুরেন্দ্র সিং বলেছিলেন ২০১৯-র নির্বাচন হবে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। অতীতে কিছু হলেই বিরোধীদের পাকিস্তানি বা পাকিস্তানে যাও বলা হয়েছে। এবার তাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে ঘটেছে পুলওয়ামা বিস্ফোরণ।

১৪ ফেব্রুয়ারির এই বিস্ফোরণে ৪০ জন আধা-সেনা তথা সিআরপিএফ জওয়ান নিহত হয়েছেন। একসঙ্গে দল বেঁধে নিয়মবিরুদ্ধভাবে পাঠানো হচ্ছিল ২৫০০ জওয়ানকে। ৭৮টি লজ্‌ঝড়ে বাসে করে। কীভাবে ঘটল বিস্ফোরণ— তার প্রকৃত সত্য আজও অজানা। মোদী সরকার সূত্রে দাবি করা হয়েছে, আদিল দার নামে জৈশ-ই-মহম্মদের এক জঙ্গি গাড়ি ভর্তি ৩৫০ কেজি আরডিএক্স নিয়ে আত্মঘাতী হামলা চালায়। দুটি বাসে থাকা ৪০ জন কর্মী নিহত হন। আচ্ছা দুটি বাসে মোট কতজন জওয়ান ছিলেন। কতজন নিহত জানা গেছে। যদিও নানা সংখ্যা— ৪২, ৪৯, ৫০ ইত্যাদি। এ-বিষয়ে একটি মাত্র সরকারি বিবৃতি চোখে পড়েছে। তাতে সংখ্যা ৪০। কিন্তু কীভাবে ঘটল? কোন পথে এল বিস্ফোরক? ওই বিস্ফোরক যে আরডিএক্স-ই তা কীভাবে কোন পরীক্ষায় প্রমাণিত হল। আর কেজি এই পরিমাণই-বা কী করে ঠিক হল এক ঘণ্টার মধ্যে? কারা কোন পথে কীভাবে বিস্ফোরক পাঠাল?

২

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরের কাছে খাগড়াগড়ে ২ অক্টোবর ২০১৪ একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ছাদ ওড়েনি। আশপাশের বাড়ি ধ্বংস হয়নি। তবু বলা হয়, আরডিএক্স। নিহত সংখ্যা ২ (দুই)। সে নিয়ে আজ পাঁচ বছর ধরে এনআইএ তদন্ত চলছে। প্রায়ই 'মূল চক্রী' ধরা পড়ছে। একটা বাড়িতে বিস্ফোরণ নিয়ে এনআইএ তদন্ত হয়— আর জাতীয় নিরাপত্তা জড়িত সে বিষয়ে এনআইএ বা বিচারবিভাগীয় কোনো তদন্তের কথা কেউ শুনেছেন? জানা জরুরি, তো কীভাবে কোন পথে বিস্ফোরক এল? নাহলে তো আবার ঘটতে পারে এরকম আরো বিপজ্জনক ঘটনা?

কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই। ২৫ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নজরুল মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, পুলওয়ামা হামলার কথা মোদী আগেই জানতেন। মমতা সম্পর্কে দুর্বলতার প্রশ্ন নেই, কিন্তু এই মারাত্মক অভিযোগ— একজন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে একজন মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ— বিজেপি-র ছোটো বড়ো সেজো মেজো কোনো নেতা প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহস পেলেন না। পরদিন সকালেই মমতার এই অভিযোগ সংবাদপত্রে দেখার আগেই দেশবাসী জানলেন, পাকিস্তানের তিন জায়গায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক। এখন আর বাকি দু-জায়গার নাম অনুচ্চারিত। শুধু বালাকোটের নাম। সেখানে নাকি ৩৫০ জঙ্গি নিহত। সেই নিয়ে কত বক্তব্য: মোদী— চুপ।

নির্মলা সীতারামণ (প্রতিরক্ষা মন্ত্রী): কিছু বলব না। অমিত শাহ: ২৫০ জন জঙ্গি নিহত ভি কে সিং (রাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা দপ্তর): এটা অমিত শাহের অনুমান।

রাজনাথ সিং: (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) বালাকোটে ৩০০ মোবাইলের সিগন্যাল মিলেছে। (যেন, শুধু জঙ্গিরাই মোবাইল ব্যবহার করে।)

এস এস আলুওয়ালিয়া (কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী): কেউ মারা যায়নি শুধু ভয় দেখাতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইক।

বিবিসি, রয়টার্স, গার্ডিয়ান, নিউ ইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিকরা ঘটনাস্থল ঘুরে এসে বলছেন ১১টি পাইন গাছ ধ্বংস হয়েছে এবং একটি কাক মারা গেছে।

৩

ভারত-পাক সীমান্তে এমনকী বাংলাদেশ সীমান্তেও দু-পক্ষের গোলাগুলি ছোড়া নতুন কোনো ঘটনা নয়। এবারও চলেছে। চলছে। হয়তো নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্তও চলবে। বিজেপির হাতিয়ার তো বিদ্বেষ বিভাজন বিস্ফোরণ বিদেশি আতঙ্ক এবং বিদেশিদের কাছে দেশের সম্পদ জলের দরে বেচা। ২০১৪-র ছিল সুদিন বা 'আচ্ছে দিন'-এর প্রতিশ্রুতি। তা পূরণ হয়নি। বছরে ২ (দুই) কোটি বেকারের চাকরি, প্রতি হাতে কাজ, প্রতি খেতে জল, প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, জিনিসের দাম ২৫ শতাংশ কমানো, গ্যাসের দাম কমানো, আধার কার্ড বিরোধিতা, প্রত্যেক ভারতীয়কে ১৫ লাখ করে দেওয়া, কালো টাকা দেশে ফিরিয়ে আনা— তার কোনোটাই হয়নি। উলটো হয়েছে। এমনকী রামমন্দির হয়নি। কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা বাতিল করা যায়নি। যদিও অ-কাশ্মীরিদের জন্য ৪৯ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে অর্ডিন্যান্স জারি করে মার্চ মাসের শুরুতে। চৌকিদার বলেছিলেন, দেশ সুরক্ষিত। কিন্তু চৌকিদারের আমলে পাঠানকোট, উরিতে সেনানিবাসে হামলা হয়েছে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইকও হয়েছে। (তাতে সেনা মরেছে। বিজেপি উত্তরপ্রদেশে ভোটে জিতেছে, প্রচার করে)।

৪

মোদী ক্ষমতায় আসার ৮৯৬ জন সৈন্য জঙ্গি হামলায় নিহত। মনমোহন জমানার চেয়ে ৯৩ শতাংশ বেশি। সেনাদের আত্মহত্যার সংখ্যা বেড়েছে। দু-লাখ সেনা ছাঁটাই হয়েছেন। ২৪৭ জন আইএএস অফিসারকে ছাঁটাই করা হয়েছে। সিয়াচেনে প্রহরারত আধা সেনা ও সেনাদের অত্যন্ত খারাপ খাবার দেওয়া হচ্ছে অভিযোগ করে, চাকরি গেছে তেজপ্রকাশ যাদবের। তেজপ্রকাশের ফেসবুক দেওয়াল যদিও আরএসএস-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল। তেজপ্রকাশ যাদব বরখাস্তের বিরোধিতা করে যন্তরমন্তরে ধর্না দিয়েছিলেন। ৫ মার্চ ২০১৯ তিনি আবার মুখ খুলেছেন। বলেছেন, মোদী সরকার পুলওয়ামায় হামলা ঘটিয়ে জওয়ানদের মেরেছে। বলেছেন, আইইডি জ্যামারের দাম মাত্র ৬০-৭০ হাজার টাকা। তা কেন ব্যবহার করল না ভারত সরকার? পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ার বাসিন্দা পুলওয়ামায় হামলায় নিহত বাবলু সাঁতরার স্ত্রী মিতা সাঁতরাও প্রশ্ন তুলেছেন, জ্যামার কেন ছিল না? যদিও বাংলা সংবাদপত্র পড়ে বোঝা যায়নি কোন জ্যামারের কথা তিনি বলেছিলেন। তেজপ্রকাশ যাদব স্পষ্ট করে দিয়েছেন— বিস্ফোরকবিরোধী জ্যামার। ফেব্রুয়ারি মাসেই গোয়েন্দা দপ্তর পাঁচ-পাঁচবার প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল সেনা কনভয়ে হামলা হবে। সিআরপিএফ তা জেনে আকাশপথে বিমানে ২৫০০ আধা জওয়ানকে জম্মু থেকে শ্রীনগরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। খরচ হত বড়োজোর ৩ (তিন কোটি টাকা)। কিন্তু রাজনাথ সিংয়ের স্বরাষ্ট্রদপ্তর তার অনুমতি দেয়নি। বিস্ফোরক প্রতিরোধী জ্যামারের ব্যবস্থা পর্যন্ত করেওনি। ইচ্ছাকৃতভাবে আধা সেনাদের মরতে দিয়েছে। ভোটের ফায়দা তোলার জন্য!

৫

কারা করেছে হামলা? ঘটনার এক ঘণ্টার মধ্যে জৈশই মহম্মদের নামে প্রচারিত হল— তারা হামলার দায় নিয়েছে। কিন্তু সে সংক্রান্ত লিখিত বিবৃতি চোখে পড়েনি। একটি ভিডিয়ো বার্তা আছে। তা যে আদিল দাবের তা ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত নয়। মাসুদ আজহারের শালা ভাইয়ের নামে অডিয়ো বার্তা আসছে। আজকের দিনে অডিয়ো বার্তা? ভিডিয়ো নয়? কারা করছে, কিছু কি বোঝার উপায় আছে?

শিবসেনা, এখনও বিজেপি-র জোটসঙ্গী মহারাষ্ট্রে। তারাও দাবি তুলেছে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে সেনা হামলায় নিহতের সংখ্যা জানানোর। আর রাজ ঠাকরে বলেছেন, এনএসএ প্রধান অজিত দোভালকে জেরা করলেই জানা যাবে, পুলওয়ামা হত্যাকাণ্ড কারা ঘটিয়েছে? রাজ ঠাকরের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা কিন্তু অশ্রুত।

৬

যুদ্ধে প্রথম নিহত হয় সত্য।

আজকের দিনে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রের নাম প্রচার। এই মিথ্যা প্রচারে গোয়েবলসীয় শিক্ষায়— কু-শিক্ষিত বিজেপি প্রথম ধাপে এগিয়ে ছিল। ২০১৪-য় তারা ক্ষমতায় আসতে পেরেছে সামাজিক মাধ্যম ও প্রচারমাধ্যমকে ব্যবহার করে। ২০১৯-এ কিন্তু ভিন্ন হাওয়া। 'ওয়াশিংটন পোস্ট' বলেছে ভারতে প্রচারমাধ্যম বিজেপি-র প্রচারে সাহায্য করেছে। কোনো প্রশ্ন তোলেনি। ইচ্ছামত বালাকোটে মৃতের সংখ্যা বলেছে। কেউ ৪০০, কেউ ৩০০, কেউ ৩৫০, কেউ ২৫০। টিআরপি বানানোর প্রতিযোগিতা যেন।

কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এবার বিদ্বেষ ও যুদ্ধবিরোধীরা রীতিমতো সক্রিয় ছিল। সরকারি ও সরকারি পয়সায় চলা বেসরকারি প্রচারমাধ্যম চ্যালেঞ্জের জোর প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অনেকেই টিভি দেখা ছেড়েছেন। সামাজিক মাধ্যমের ফলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বক্তব্য মানুষ শুনতে পেয়েছেন। ইমরান দিয়েছেন শান্তির বার্তা। তা মানুষকে স্পর্শ করেছে। অভিনন্দনকে ছাড়ার ঘটনায় তাঁর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। এখন তো ৪২ জন জঙ্গিকে গ্রেপ্তারও করেছে পাকিস্তান সরকার। তার মধ্যে আছে মাসুদ আজহারের ভাই ও ছেলে।

৭

যদিও মনে রাখতে হবে, অতীতে পাকিস্তান সরকার ও শাসকশ্রেণির ভূমিকা ভালো নয়। আফগানিস্তানের নাজিবুল্লাহ সরকারের পতনে সিআইএ-র মদতে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে অর্থ, আশ্রয় ও অস্ত্র দিয়েছেন তাঁরা। সৌদি আরব মারফত আই সিস ও তালিবানরা আফগানিস্তান, ইরাক, ইরান, সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে। পাকিস্তানে মার্কিনি মদতে বহু জঙ্গি ঘাঁটিও আছে। তার ফলে পাকিস্তানের জনগণ বেশ বিপন্ন। এ পর্যন্ত ১০,৭৮৬ জন সন্ত্রাসবাদী হামলায় নিহত পাকিস্তানে। ভারতে ১৯৮০ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী হামলা ৮২টি। আর শুধু মোদী আসার পর ১৮টি। যদিও মনে রাখা দরকার, সিআরপিএফ জওয়ানদের ওপর হামলা নতুন নয়। সিআরপিএফ নিয়েও অভিযোগ আছে। সেনাদের মতো সুযোগসুবিধা না পাওয়া, ক্যান্টিনের অধিকার না পাওয়া, ২০০৪ থেকে পেনশন সুবিধাহীন জওয়ানরা শিলদা, দান্তেওয়াড়ায় নিহত হয়েছেন। দান্তেওয়াডায় নিহত সর্বাধিক। ৭৫ জন। কিন্তু তখন দেশজুড়ে এভাবে আলোড়ন হয়নি। হয়তো জায়গা কাশ্মীর এবং আততায়ীর নাম 'মুসলিম' বলে এবং পাকিস্তান যোগের গন্ধ আছে বলে।

৮

মোদী সরকার ব্যর্থ অর্থনীতি, শিক্ষা স্বাস্থ্য সবেতেই। ব্যর্থ প্রতিরক্ষাতেও। শুধু ভাষণবাজি আর নৌটঙ্কি করে চলছে সরকার। মুখে সেনা প্রেম, কার্যত সেনাদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস। পাকিস্তানের মদত সৌদি যুবরাজকে আলিঙ্গন করতে যেতে পারেন প্রোটোকল ভেঙে বিমানবন্দরে, কিন্তু অভিনন্দনকে আনতে যেতে পারেন না। অভিনন্দনের বন্দিত্ব দুঃখজনক ঘটনা। কিন্তু আবার এটা না ঘটলে হয়তো এতদিনে পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত।

৯

মুখে দেশপ্রেম। কার্যত দেশ বেচা। এবং দেশ ধ্বংস। ১৪ ফেব্রুয়ারির পর সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা হল। প্রধানমন্ত্রী গেলেন না। নিজেই ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচারে। ক-দিন আগে কাশ্মীরে গিয়ে ফাঁকা লেকে হাত নেড়ে এলেন। এখন শুধু পোশাক বদলানো ও ভাষণবাজি। মাঝে সিওল গেলেন শান্তি পুরস্কার আনতে। আর এসেই যুদ্ধ হুংকার। ঘরে ঘরে ঢুকে মারব। একি প্রধানমন্ত্রীর মুখের ভাষা? না, পাড়ার মস্তানের?

দেবেগৌড়া সঠিক বলেছেন, মোদী প্রধানমন্ত্রী পদের অমর্যাদা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী কোনো সাংবাদিক সম্মেলন করেননি। সেনা কর্তৃপক্ষও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেননি। দেশ তো এভাবে চলতে পারে না। জনগণের করের টাকায় সরকার চলে। জনগণের অধিকার আছে— সব জানার। মোদী মত্ত ক্ষমতার আকর্ষণে। কিন্তু ক্ষমতায় ফেরা এত যাত্রা সহজ হবে বলে মনে হয় না। ইভিএম কারচুপি ছাড়া গতি নাই। পুলওয়ামার ঘটনার পর থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত মোদী ২০টির বেশি জনসভা করলেও বিরোধীরা জনসভা বা নির্বাচনী প্রচার করেননি। ২১ দলের বৈঠক ডেকে বিরোধীরা সেনা ও সরকারের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু মোদী ও বিজেপি আছে সংঘতেই। তাদের ডোন্ট কেয়ার ভাব। তার জবাবও দিচ্ছেন মানুষ। বিহারের গান্ধী ময়দানের জনসভায় মাঠ ফাঁকা। গুজরাতে আগ্নেয়াস্ত্রধারী মোদীর ছবি। তবু তেমন সাড়া নেই।

ন্যাড়া বেলতলায় বার বার যায় না।

১০

জনগণ ২০১৯-এ মোদীর ভোট ও ক্ষমতার জন্য দেশের সর্বনাশ করার, সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার চেষ্টার জবাব দেবে। সেনাবাহিনীকে রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো হচ্ছে। যা অতীতে কোনো সরকার করেনি।

তবে ইতিহাস শেখায়।

কার্গিলের পরও বাজপেয়ীর নির্বাচনী ফল ভালো হয়নি। মোদীরও হবে না। এটাই আশার কথা।

১১

নিরাপদ নয় স্ব-ঘোষিত চৌকিদারের হাতে দেশ জাতি মনুষ্যত্ব— কোনো কিছুই নিরাপদ নয়। নাৎসিবাদী মাত্রেই ফ্যাসিবাদী। ফ্যাসিবাদী মাত্রেই নাৎসিবাদী নয়। হিটলারি নাৎসিবাদ ছিল তীব্র ইহুদিবিদ্বেষী। ফ্যাসিবাদ সামরিক শক্তিতে সজ্জিত হয়। আরএসএস গড়ে উঠেছিল জার্মান এসএস বাহিনীর অনুসরণে। মতাদর্শ এবং সাংগঠনিক ভিত্তি এক। এসএস-এর চিহ্ন স্বস্তিক। আরএসএস-এরও তো তাই। মিথ্যা প্রচার, ঝটিকা আক্রমণ, গণপ্রহার, জনগণকে নিষ্ক্রিয় করা, মানবিকবোধ বিসর্জন দেওয়া, যে কাউকে যখন খুশি চেক করা, বিরোধী মতের কেউ হলে তার ওপর হামলা— হিটলারি বাহিনীর সমস্ত অপগুণ সঞ্চিত সঞ্চারিত এবং বিস্ফারিত মোদী বাহিনীর মধ্যে।

১২

২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাইখস্টাগে অগ্নিসংযোগ করেছিল হিটলারি বাহিনী। দোষ চাপিয়েছিল কমিউনিস্ট ও ইহুদিদের ওপর। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০২— গোধরায় ট্রেনে অগ্নিসংযোগ। এবার নির্বাচনের আগে ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পুলওয়ামায় আধা-সেনার কনভয়ে বিস্ফোরণ। যে ঘটনা নিয়ে এখন বিজেপি মোটামুটি চুপ। জওয়ানের মৃত্যু নিয়ে ফায়দা তুলতে চাইছে—

কিন্তু কেন ঘটল সে নিয়ে নিশ্চুপ। উত্তরপ্রদেশের অজয় বিস্ট ওরফে যোগী মন্ত্রীসভার উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব মৌর্য পুলওয়ামাকে বলেছেন, দুর্ঘটনা। কংগ্রেসের দিগ্বিজয় সিং একথা বলায় তাঁকে দেশদ্রোহী বলা হয়েছিল। বিজেপি-র এক সাংসদ এবং উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব মৌর্যও এক কথা বলেছেন। কী হবে।

এর মাঝে খবর এলে, ৬ মার্চ দুপুরে। সুপ্রিম কোর্টে মোদী সরকার জানিয়েছে রাফায়েল ফাইল চুরি। ফাইল রাখতে পারে না, দেশ রাখবে? ৫ মার্চ বিজেপি-র ওয়েবসাইট হ্যাক বা বন্ধ হয়ে গেল। ৮ মার্চও খোলেনি। ৬ মার্চ দুপুরে পুড়িয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার দিল্লি দপ্তর। যেখানে ছিল বায়ুসেনার সব নথি। রাফায়েল ফাইল চুরি এবং বায়ুসেনার সমস্ত ফাইল পুড়িয়ে দেওয়া? নির্বাচনী পরাজয়ের আগাম ইঙ্গিত?

প্রশ্ন: পুলওয়ামা

১. মোদী ভোগি শাহের সভায় কেউ কালো অন্তর্বাস পড়ে যেতে পারে না, ৩৫০ কেজি আরডিএক্স বিনা যাচাইয়ে চলে গেল?
২. বিস্ফোরণের ১ ঘন্টার মধ্যে ফরেনসিক তদন্ত ছাড়াই কী ছিল? কত কেজি? কী করে জানা গেল?
৩. আজকের জিপিএস যুগে জৈশ-ই-মহম্মদ কোথা থেকে বিবৃতি দিল জানা গেল না?
৪. পুলওয়ামা বিস্ফোরণ ষড়যন্ত্র কোথায় হল?
৫. আততায়ী কোন পথে ঢুকল?
৬. চেকিং দায়িত্ব কাদের ছিল?
৭. চেকিং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার জন্য কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে কি না?
৮. আইডি বিস্ফোরণের আগাম খবর দেওয়া সত্ত্বেও কার্যকর ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্য কাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে?
৯. আইডি রিপোর্ট সত্ত্বেও বিমানপথে আধা সমরিক বাহিনী জওয়ানদের সড়ক পথে নিয়ে যাওয়া হল কেন?
১০. নিহত জওয়ানদের পরিবার কি পেনশন পাবেন?
১১. নিহত জওয়ানদের পরিবারের কেউ কি চাকরি পাবেন?
১২. দান্তেওয়াড়ায় ৭৫ জন মারা গেছেন? গত পৌনে পাঁচ বছরে ৮৯৬ জন মারা গেছেন। কতজনকে শহিদ সম্মান দেওয়া হয়েছে।
১৩. নিহত জওয়ানরা কি সেনাবাহিনীর মতো ক্যান্টিন ও অন্যান্য সুবিধা পেতেন?
১৪. সিআরপিএফ জওয়ানদের পেনশন কবে থেকে বন্ধ হল?
১৫. বাজপেয়ী সরকার কেন সিআরপিএফ-সহ অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর পেনশন বন্ধ করে দেয়?

ভিন্ন সুর

১. দেশকে ভালোবাসি বলেই দেশের নামে মিথ্যা প্রচার শুনতে চাই না।
২. দেশকে ভালোবাসি বলেই বিজেপি বিপদে পড়লেই সেনানিবাসে হামলা কনভয়ে হামলা মারফত সেনাদের মৃত্যু চাই না।
৩. সেনাবাহিনীকে ভালোবাসি বলে বিজেপি-কে ঘৃণা করি। কারণ এরা আধাসেনাদের পেনশন ২০০৪ থেকে তুলে দিয়েছে।
৪. এরা নিহত আধা সেনাদের পেনশন চাকরি কিছুই দেয় না।
৫. দেশ ও দেশের সেনাবাহিনীকে ভালোবাসি বলে 'ব্রিং ব্যাক অভিনন্দন' দাবিতে কলকাতা দিল্লি মুম্বাইয়ে জমায়েত হয়। যখন বিজেপি ও বিজেপি-র মত্ত ভক্তরা চুপ ছিল।
৬. মোদী সরকার অভিনন্দন নিয়ে ইমরান খান তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার ঘোষণা করার আগে কোনো বিবৃতি দেয়নি।
৭. দেশকে ভালোবাসি বলে দেশের মাথা উঁচু দেখতে চাই।
৮. বিজেপি এলেই পাকিস্তানের সেনা, মিশাইল বা জঙ্গি এদেশের মাটি ছুঁয়ে ফেলে। দেশের মাথা নীচু করে দেয়।
৯. বিজেপি ক্ষমতায় থাকলে সংসদে পর্যন্ত হামলা হয়।
১০. দেশকে ভালোবাসি বলেই পুলওয়ামা বিস্ফোরণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করি।
১১. কারা কীভাবে জানল আধাসেনার কনভয়ের কথা? কারা গোপন খবর ফাঁস করল— জানতে চাই। দেশকে ভালোবাসি বলে।
১২. দেশকে ভালোবাসি বলেই জানতে চাই, কনভয়ে হামলা কীভাবে হল?
১৩. কোন পথে এল জঙ্গি? জানতে চাই।
১৪. দেশকে ভালবাসি বলেই জানতে চাই, বিস্ফোরক এলো কীভাবে?
১৫. দেশকে ভালবাসি বলে জানতে চাই, ফরেনসিক তদন্ত না করেই কী করে বলা হল, ৩৫০ কেজি বিস্ফোরক?
১৬. দেশকে ভালবাসি বলেই জানতে চাই, কে জোগাল বিস্ফোরক? কীভাবে?
১৭. কাশ্মীরে প্রতি নয় জনে একজন সৈনিক। তবু বিস্ফোরণ ঠেকাতে পারা গেল না?
১৮. দেশকে ভালবাসি বলেই জানতে চাই, কে বিস্ফোরক জোগায়? কোন ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে?
১৯. দেশকে ভালবাসি বলেই জানতে চাই, কোন দেশের বিস্ফোরক?

২০. দেশকে ভালবাসি বলেই জানতে চাই— পুলওয়ামা বিস্ফোরণে কারা তদন্ত করছে? এখন আমি এ কী করছে?

২১. দেশকে ভালবাসি বলেই জানি, মোদী এই তদন্ত করবেন না। আরো সেনা আধা সেনা মারার ব্যবস্থা হবে। গোয়েন্দা সংস্থার কথা অমান্য করা হবে পুলওয়ামা বিস্ফোরণের মত।

ভোট জিততে চাইবে। লাশ দেখিয়ে।

যুদ্ধ বা দাঙ্গা করে।

রিজার্ভ ব্যাংকের টাকা লুটপাট করে।

বিজেপি হঠাও দেশ বাঁচাও।

শেষ কথা

বিজেপি অর্ধ সত্য অস্ত্র কথায় মহাপারদর্শী।

'বিজেপি প্রচার চালায়, মুসলিম তোষণ করার জন্য কাশ্মীরে জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষ জানেন ১৯২৮ সালে ডোগরা হিন্দু রাজা হরি সিং এই আইন চালু করেছিল, অন্য কেউ নয়।

কাশ্মীরি জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ হয়েছিল অ-কাশ্মীরি হিন্দু-মুসলমান সবার জন্য।

কাশ্মীরের হিন্দুরা কাশ্মীরের যেকোনো স্থানে জমি কেনা বেচা করতে পারবে।

হিন্দু প্রধান হিমাচলপ্রদেশেও হিমাচলপ্রদেশের বাইরের কোন মানুষ, সে যে ধর্মেরই মানুষ হোক জমি কিনতে পারবেন না। হিমাচলপ্রদেশ নিয়ে কখনো বিজেপি ও আরএসএস-কে কথা বলতে শুনেছেন?

একইভাবে কাশ্মীরের মতো ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যে ৩৭০ ধারার মতো অনুরূপ ধারা ৩৭১ চালু আছে।

কোন কোন রাজ্যে চালু আছে দেখে নিন:

৩৭১ ধারা চালু আছে মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলে, গুজরাটের বিদর্ভে ও কচ্ছে।

৩৭১ (খ) - অসম উপজাতি এলাকা

৩৭১ (গ) - মণিপুর

৩৭১ (ঘ) - অন্ধ্রের কিছু অঞ্চল

৩৭১ (চ) - সিকিম

৩৭১ (ছ) - অরুণাচল

৩৭১ (জ) - মিজোরাম

সূত্র: শ্যামল চক্রবর্তী। কাশ্মীর অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। (উদ্ধৃত: মিরাজ আহমেদ)

বিজেপি প্রচারিত ৩৭০ ধারার কাশ্মীরের মত আইন বলবৎ আছে হিন্দু প্রধান রাজ্য হিমাচল প্রদেশ সহ অসম, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, মণিপুর, মিজোরাম প্রভৃতি রাজ্যেও। এইসব রাজ্যে বাইরের মানুষ জমি কিনতে পারেন না।

ভারতবর্ষের কোনো রাজ্যেই কোনো অ-আদিবাসী মানুষ আদিবাসীদের জমিও কিনতে পারেন না।

একথা বিজেপি জানায় না।

আমরাও বলি না।

নাগাল্যান্ড অরুণাচলপ্রদেশ মিজোরাম যেতে গেলে যেকোনো ভারতীয়কে আগে থেকে দরখাস্ত করে পারমিট বা অনুমতিপত্র নিতে হয়।

অথচ নেপাল যেতে অনুমতি লাগে না। নেপালিদেরও এরকম অনুমতি নিতে হয় না।

কাশ্মীরে যেতেও এরকম কোন পারমিট লাগে না।

সিকিম মেঘালয়ে মদে কর নেই।

নাগাল্যান্ড মিজোরাম অরুণাচল প্রদেশের মানুষকে আয়কর দিতে হয় না।

এরকম সুবিধা কাশ্মীর পায় না।

অভিন্ন হিন্দু আইনে আয়করে ছাড় পান হিন্দু পরিবার।

কাশ্মীরি বা যে কোন মুসলিম এই সুবিধা পান না।

কাশ্মীরে প্রিপেইড মোবাইল সুবিধা নেই। পোস্ট পেইড মোবাইল? তাও পাওয়া খুব কঠিন।

কাশ্মীরে দারিদ্র্য সীমাহীন।

'কাশ্মীর কি কলি'র যেখানে শ্যুটিং হয়েছিল সেই গুলমার্গে ১২০০০ হাজার ঘোড়া। চল্লিশ হাজার ঘোড়সওয়ারি।

দিনে ৪০টির ঘোড়া নিয়ে বের হতে পারবেন না।

ঘোড়ায় চড়িয়ে ঘোরান এরা। মাথাপিছু ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা ঘোড়ায় চড়ার খরচ।

আজকাল রোপওয়ে চালু। ঘোড়ায় চাপতে কেউ চান না। তিনমাস পর ঘোড়া বের করতে পারেন মানুষ। দেখবেন মানুষের গাল তোবড়ানো। একটা গাড়ি দেখলে পালে পালে ছুটে আসে মানুষ। ছিন্ন পোশাকে করুণ আবেদন:

আমার ঘোড়ায় চাপুন।

যাঁরা কাশ্মীরে গেছেন, কোন দিন চোর পকেটমারের সম্মুখীন হয়েছেন?

এরা উগ্রপন্থী কেন হবে?

হলে কেন হয়?

ভাববেন না?

কাশ্মীর সমস্যা ভারত পাকিস্তানের সরকার সমাধান করতে চায় না। নিজেদের সংকট আড়াল করতে। তাই চলবে যুদ্ধ— নির্বাচনী যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।

কলঙ্কিত বিজ্ঞান কংগ্রেস

মিহিরলাল রায়

দ্য গ্রেটেস্ট এনেমি অব্ নলেজ ইজ নট ইগনোরেন্স, ইট ইজ দ্য ইল্যুশন অব্ নলেজ।

— স্টিফেন হকিং

এবারের বিজ্ঞান কংগ্রেসও কলঙ্কিত হল। শুরুটা ২০১৫-তে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০২তম অধিবেশনেই। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সেই অধিবেশনে শুনেছিলাম বেশকিছু উদ্ভট দাবি। কী সেগুলো? আজ থেকে সাত হাজার বছর আগেই নাকি বৈদিক যুগে মহর্ষি ভরদ্বাজ মুনি বিমানের বিবরণ দিয়েছিলেন। তাও এখনকার বিমানের চেয়ে আকারে ছ-শো গুণ বড়ো। আজকালকার বিমান যেখানে ওড়ে একমুখে, সেসব উড়ত দশ দিকে। শুধু এই পৃথিবীতেই নয়, পাড়ি দিত গ্রহ থেকে গ্রহান্তরেও। আর গতি? এই সময়ের জেট বিমানের একশো গুণ। ইঞ্জিন ছিল এমনকী চল্লিশটি। কী ছিল জ্বালানি? আজকালের মতো পেট্রোল নয়। তার প্রয়োজন ছিল না। হাতি, গরু, গাধা— এসবের মূত্র দিয়েই কেল্লাফতে! একটি পাত্রে পারদে মেশানো হাতির মূত্রে চোবানো 'অপমার্গ', 'সমপার্গ', ও 'আয়সকাণ্ড'। অন্য পাত্রে গাধা কিংবা গো-মূত্র দিয়েই বিমানের জ্বালানি। এখন যেমন বিভিন্ন মিশ্র ধাতু দিয়ে বিমান তৈরি হয়, সেকালেও হত। তবে তফাত হচ্ছে সে-সকল সংকর ধাতু বিদেশ থেকে আনতে হত না। ভারতেই তৈরি হত। অর্থাৎ 'মেড ইন ইন্ডিয়া'। 'অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান অ্যাভিয়েশন টেকনোলজি' শীর্ষক নিবন্ধ উপস্থাপন করে এমন সব দাবিই করেছিলেন বোডাস সাহেব। ওই বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিভিন্ন ডিসপ্লেও ছিল আজগুবি সব দাবি নিয়ে। যেমন, একটা ডিসপ্লে-তে ছিল প্রাচীন রকেট, যা বৃষ্টি ও কুয়াশা ভেদ করে ছুটতে পারত। প্রাচীনকালে নাকি 'হেলমেট'-এরও ব্যবহার ছিল। মানুষ গ্রহ থেকে গ্রহান্তরেও পাড়ি দিত। একটা ডিসপ্লে-তে দেখানো হয়েছিল দুই রাজার যুদ্ধ। একজন আরেকজনকে ধাওয়া করছেন পৃথিবী থেকে চাঁদে, চাঁদ থেকে মঙ্গলে। দ্বিতীয় জন শেষপর্যন্ত প্রথম জনকে আঘাত করতে সক্ষম হলেন, ভাঙলেন তার 'হেলমেট'টি। প্রাচীনকালের প্লাস্টিক সার্জারি(!) বিষয়ক ডিসপ্লেও ছিল। গণেশের ক্ষেত্রে কেমন করে হাতির মাথা সংযোজিত হয়েছিল। এজন্য নাকি গরম চিনিই ব্যবহৃত হয়েছিল।

গণেশের ঘাড়ে মানুষের মাথা এবং প্লাস্টিক সার্জারি প্রসঙ্গ এলেই মনে পড়ে এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক ভাষণের কথা। ওই বিজ্ঞান কংগ্রেসের আগে ২০১৪-এর অক্টোবরে মুম্বইতে স্যর এইচ এন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার-এর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে এমন কথা বলেছেন তিনি। অতীত দিনের তথাকথিত 'তেজোময় ভারত' প্রসঙ্গ টেনে পৌরানিক চরিত্র 'গণেশ'-এর উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন তিনি— 'আমরা ভগবান গণেশকে পূজা করি। এটা নিশ্চিত, হয়তো একটা সময়ে কেউ প্লাস্টিক সার্জন ছিলেন, যিনি মানুষের শরীরে হাতির মুখ বসাতে সক্ষম হয়েছিলেন।' হাতির মুখ মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপনের মানেটা কী? বিজ্ঞানের ভাষায় বলা যেতে পারে 'ইন্টার-স্পিসিস হেড ট্র্যান্সপ্লানটেশন'। অর্থাৎ 'আন্তঃ-প্রজাতি মস্তক স্থানান্তরকরণ'। কী বলবেন আধুনিক নিউরো সার্জনেরা? দূরে থাকুক আন্তঃ-প্রজাতি স্থানান্তরকরণ, একই প্রজাতিতেও তা কতটুকু বাস্তব?

১০৩ ও ১০৪তম অধিবেশনও এসব থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল, তা বলা যাবে না। ১০৪তম অধিবেশনের শুরুটাই তো 'বালাজি বন্দনা' দিয়ে। শুধু কি তাই? উদ্‌বোধনী মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর দোসর অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু তো ঘোষণাই করেছেন— 'বিজ্ঞান কংগ্রেসেরও প্রয়োজন আছে ঈশ্বরের আশীর্বাদ'। তাঁর মতে তা নাকি বর্ষিত হয়েছিল। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে? আবেগ আপ্লুত কন্ঠে তাঁর উচ্চারণ— 'ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে পুণ্য(!) নগর তিরুপতিতে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞানীদের সান্নিধ্য পেয়ে আমি আনন্দিত।' শুধু কি তাই? উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হতে না

হতেই ছুটে গেছেন তিরুমালায় ভগবান বালাজি দর্শনে। উপোস ভেঙেছেন পূজার্চনা শেষে। এর আগে অবশ্য আরো একটা কাজ সারা হয়েছিল তাঁর সরকারের পক্ষ থেকে। কী সেটা? তথাকথিত বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে তিরুপতি মন্দিরের সম্পৃক্তকরণ। রাষ্ট্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট অর্গানাইজেশনের সঙ্গে মন্দির কর্তৃপক্ষের এক চুক্তি সই। 'বেদ'-এর 'সামরিক বিজ্ঞান' নিয়ে গবেষণা করার।

কী বলতেন এসব দেখলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে যাঁর সম্পৃক্ততা সর্বজনবিদিত, যিনি সওয়াল করতেন 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ'-এর? প্রশ্ন এটাও, কী বলতেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি স্যর আশুতোষ মুখার্জি? যিনি ১৯১৪ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে আয়োজিত প্রথম অধিবেশনেই ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন— "রিমোভেল অব্ অ্যানি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অব পাব্লিক কাইন্ড হুইচ মে ইম্পেড সায়েন্স প্রোমোশন।"

জানতে চাওয়া, বুঝতে চাওয়া মানুষের স্বাভাবিক আকুতি। কিন্তু এ পথের প্রধান কাঁটাটি কী? সদ্য প্রয়াত বিজ্ঞান স্টিফেন হকিং-এর মতে, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাটা অজ্ঞানতা নয়, বাধাটা হচ্ছে জ্ঞানের বিভ্রম। তাঁর ভাষায়, 'দ্য গ্রেটেস্ট এনেমি অব নলেজ ইজ নট ইগনোরেন্স, ইট ইজ দ্য ইল্যুশন অব নলেজ।' মণিপুরের ইম্ফলে আয়োজিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১০৫-তম অধিবেশনের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞানী হকিং-কে স্মরণ করতে গিয়ে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী হর্ষবর্ধন (যিনি নিজে একজন চিকিৎসকও)-এর উক্তি সে সম্ভাবনাকেই প্রকট করেছে। কী এমন কথা বলেছেন তিনি? তিনি বলেছেন, স্টিফেন হকিং নাকি বলেছেন আমাদের 'বেদ'-এ আইনস্টাইনের বহুখ্যাত 'মাস এনার্জি ইকুয়েশন'-এর চেয়েও উন্নত তত্ত্ব রয়েছে। কবে, কোথায় এমন কথা বলেছেন হকিং? এমন প্রশ্নই সাংবাদিকেরা করেছিলেন মাননীয় মন্ত্রীকে। জবাব এড়িয়ে সাংবাদিকদের দায় ঠেলে দিয়ে বলেছিলেন তিনি— 'যা বলার প্রকাশ্য মঞ্চেই বলেছি (বোঝাই যায় অজ্ঞানতাজনিত আলটপকা উক্তি নয়, ইচ্ছাকৃত ও বেপরোয়াভাবে এ দেশের অতীত জ্ঞান সম্পর্কে মিথ্যা বিভ্রম সৃষ্টির পরিকল্পিত প্রয়াস)। আপনারাই খুঁজে দেখুন। না পেলে আমার কাছে আসবেন।' সাংবাদিকেরা অবিশ্যি সত্যি সত্যিই মাননীয় মন্ত্রীর পরামর্শ মাথা পেতে নিয়েছিলেন। গভীর অনুসন্ধান করেছেন। সন্ধানও পেয়েছেন তথ্যসূত্রের। কী সেটা? তথাকথিত হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক রিসার্চ অন বেদাস'-এর ওয়েবসাইটে এমন কথা আছে। ওই ওয়েবসাইটের যে নিবন্ধে এমন কথা আছে, তাতে কি কোনো তথ্যসূত্র আছে? না, নেই। সংগঠনের চেয়ারম্যান কে ভি কৃষ্ণমূর্তির একটি চিঠি অবশ্য রয়েছে ওই ওয়েবসাইটে, যা তিনি ২০১৩-তে লিখেছিলেন স্টিফেন হকিং-কে। ওই চিঠিতে তিনি বিজ্ঞানী হকিং-কে অনুরোধ করেছিলেন জনৈক ড. শিবরাম শাকামুরির 'দ্য ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড ফারমিওনস (বৈদিক মডেল)' নামীয় তথাকথিত গবেষণা নিবন্ধের উপর মতামত ব্যক্ত করতে। কী জবাব ছিল স্টিফেন হকিং-এর? স্টিফেন হকিং-এরই একজন টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ই-মেল বার্তাতে লিখেছেন— 'অধ্যাপক হকিং-কে পাঠানো ই-মেল-এর জন্য ধন্যবাদ। আশা করি, আপনি কল্পনা করতে পারছেন যে প্রতিদিন অধ্যাপক হকিং এমন কত অনুরোধ পান। কাজের চাপ, অগুনতি এমন অনুরোধ এবং সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দেখার লোকাভাবের কারণে উত্তর দিতে না পারার জন্য অধ্যাপক হকিং দুঃখ প্রকাশ করেছেন।' কী জবাব দেবেন হর্ষবর্ধনজি?

এসব নিয়ে অনেক গুণীজনেরাই উষ্মা প্রকাশ করেছেন। প্রতিবাদেও সোচ্চার হয়েছেন। নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী বেঙ্কটরমণ রামকৃষ্ণান সখেদে উচ্চারণ করেছেন— 'বিজ্ঞান কংগ্রেস এখন সার্কাস।' ২০১৬-তে আয়োজিত বিজ্ঞান কংগ্রেসে তিনি এসেছিলেন। কিন্তু বলেছেন— 'আর কখনো অংশ নেব না।' কেন? দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর উক্তি— 'কেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে অংশ নিয়ে আমি আমার সময় অপচয় করব, যেখানে খুব কমই বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা হয়। পৌরাণিক কল্পকথার রাবিশ নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। সদ্যপ্রয়াত প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী পুষ্প ভার্গব ২০১৭-তে মন্তব্য করেছিলেন— 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের এত অধঃপতন হয়েছে যে, যুক্তিহীন কুসংস্কার ও অবাস্তবকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় বসাতে চাইছে।' এত যে উষ্মা, প্রতিবাদ সম্বিত ফিরেছে কি? না ফেরেনি। বরং ২০১৯-এ, ১০৬-তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসকে যেন হিন্দুত্ববাদীরা আরো বেপরোয়াভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে। ওই অধিবেশনের মঞ্চ থেকে পুরাণকথাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে, অবাস্তব উদ্ভট কথাকে বিজ্ঞান বলে চালাতে চেষ্টা করেছে।

কী হয়েছে এ-বছর পাঞ্জাবের জলন্ধরে জানুয়ারির ৩ থেকে ৭ তারিখে আয়োজিত ১০৬-তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে? ওরা ওই বিজ্ঞান কংগ্রেসের শিশুবিজ্ঞানীদের অধিবেশনে বিজ্ঞানের নামে আজগুবি সব কথা বলেছে। আমন্ত্রিত বক্তা কান্নন জেগাথালা কৃষ্ণান বলেছেন— আইনস্টাইনের 'থিওরি অব রিলেটিভিটি', নিউটনের 'থিওরি অব্ গ্র্যাভিটি' এবং হকিং-এর 'থিওরিস অব ব্ল্যাকহোল'— সবই অসার। আইনস্টাইন

মহাকর্ষীয় বিকর্ষণ বল সংক্রান্ত যা যা বলেছেন, তার আদ্যোপান্তই নাকি ভুলে ভরা। তিনি শিশু বিজ্ঞানীদের তাদের গাইড-শিক্ষকদের আরো জানিয়েছেন যে, সহসাই তিনি এক নতুন তত্ত্ব দেবেন। তাতে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের নাম হবে 'নরেন্দ্র মোদী তরঙ্গ'। আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব্ রিলেটিভিটি অনুযায়ী বস্তুর উপস্থিতিতে স্পেস টাইম এবং আলোকের পথ বক্র হয়ে যেতে পারে। কৃষ্ণানের অভিমত এই 'গ্রাভিটেশনাল লেন্সিং এফেক্ট'-এর নাম হওয়া উচিত 'হর্ষবর্ধন এফেক্ট'। তিনি এটাও মনে করেন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি ও দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালামের চেয়েও কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী হর্ষবর্ধন অনেক বড়ো মাপের বিজ্ঞানী। কী বলবেন এমন সব তত্ত্ব আর তথ্যকে বিজ্ঞানেরই মঞ্চে উপস্থাপনকে? কে এই কান্নন জেগাথালা কৃষ্ণান, যিনি 'আমন্ত্রিত বিজ্ঞানী' হিসাবে সুযোগ পেলেন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে এমন সব তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপনে? কর্তাভজা, মোদীজি আর হর্ষবর্ধনের চাটুকার এই কৃষ্ণান একজন প্রকৌশলী হলেও সংবাদে প্রকাশ, যুক্ত আছেন তামিলনাড়ুর আলিয়ারে ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি সেন্টারে একজন 'সিনিয়র সায়েন্টিস্ট(!) হিসেবে। বিজ্ঞানের জগতে ওই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাটা কেমন? তারা 'কুণ্ডলিনী যোগ' শেখায়। অন্যান্য ধর্মীয় গুরুদের মতো আরো কিছু ব্যাবসা রয়েছে ওই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের। এমন প্রতিষ্ঠানের, স্বঘোষিত বিজ্ঞানীকে কেমন করে ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে 'আমন্ত্রিত বিজ্ঞানী'-র মর্যাদা দেওয়া হল?

শিশু বিজ্ঞানীদের ওই অধিবেশনে 'আমন্ত্রিত বক্তা' হিসেবে বক্তব্য রেখেছেন অন্ধ্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জি নাগেশ্বর রাওও। তিনি কী বললেন? তিনি বললেন— 'স্টেম সেল রিসার্চ ও টেস্টটিউব বেবি প্রযুক্তির জেরেই একজন মা থেকে একশো জন কৌরব পেয়েছিলাম আমরা। যা ঘটেছিল আজ থেকে হাজার বছর আগে। ওটা ছিল এই দেশের বিজ্ঞান।' মহাভারতে বর্ণিত প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন 'একশোটি ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করে মাটির পাত্রে রাখা হয়েছিল— এগুলো কি টেস্টটিউব বেবি নয়?' শুধু টেস্টটিউব বেবিতেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন তিনি নিজেকে। তাঁর মতে মহাভারতে কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র ছিল আসলে এক 'গাইডেড মিসাইল'। তাঁর আরো দাবি, রামায়ণের রাবণের কাছে ছিল ২৪ রকমের বিমান। শ্রীলঙ্কায় ছিল বিমানবন্দর। অধ্যাপক রাও এটাও বলেছেন, হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর দশাবতারের গল্প হচ্ছে আসলে বিবর্তনবাদ। এটা নাকি চার্লস ডারউইনের তত্ত্বের চেয়েও উন্নত। তাঁর ভাষায়— 'মৎস্য অবতারের মাধ্যমে দশাবতারের সূচনা। সেই অবতার একটি সামুদ্রিক প্রাণী। এরপর আসছে কুম্ভ অবতার। এটি উভচর প্রাণী। জলের পাশাপাশি ডাঙাতেও থাকে। তৃতীয় অবতার হল বরাহ। এইসময় বিষ্ণু বরাহ রূপ ধারণ করে বিশ্বকে রক্ষা করেন। চতুর্থ অবতার হল নরসিংহ, যা অর্ধেক সিংহ এবং অর্ধেক মানুষ।' পঞ্চম অবতার বামন। এই অবতার সম্পূর্ণ মানুষ হলেও, পরিপক্বতার কিছুটা অভাব আছে। তারপর তাঁর আরো সংযোজন— 'পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী মানুষের বিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানে শুধু সামুদ্রিক প্রাণী থেকে মানুষে পরিণত হওয়ার কথা বলা হয়নি, আমাদের বিজ্ঞান এর ঊর্ধ্বে। বামন অবতারের সময় আমরা মানুষ হয়ে উঠেছিলাম, তবে এর পরবর্তীকালে আমরা পরিণত মানুষ হয়ে উঠি। আমাদের সাধুসন্তদের ভাবনা সুদূরপ্রসারী ছিল।' ভাবতে আশ্চর্য লাগে এমনতর পণ্ডিত(!)-ই আছেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জমানায় এমনতর পণ্ডিতদেরই পুনর্বাসন পীঠ দেশের বৌদ্ধিক, এমনকী বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠানগুলোতেও।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মতো ওই সম্মেলনে ওই দুই আমন্ত্রিত বক্তার এহেন বক্তব্য নিয়ে রীতিমতো সমালোচনার ঝড় বইছে দেশে ও বিদেশেও। ব্যঙ্গ, বিদ্রুপে ভরপুর সোশ্যাল মিডিয়া। প্রশ্ন উঠেছে, শিশুবিজ্ঞানীদের জন্য আয়োজিত 'মিট দ্য সায়েন্টিস্ট' কর্মসূচিতে কীভাবে এমনতরো বক্তারা আমন্ত্রিত হলেন? এমনকী, ভারত সরকারের মুখ্য বিজ্ঞান উপদেষ্টাকেও মন্তব্য করতে হয়েছে— 'এটা বড়োই দুভার্গ্যজনক।' সমালোচনার ঝড়ে বলতে হয়েছে, অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের উচিত হবে ভারতের উন্নত চেতনাসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের ভাষা শোনা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।

বহু ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন, যার প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখার্জি। বিভিন্ন অধিবেশনের বিভিন্ন সময়ে সি. ভি রামন, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, হুমায়ুন কবীরের মতো আলোকপ্রাপ্ত মনীষীরা সভাপতিত্ব করেছেন। সেই সংগঠন এমন কাজ হতে দিলেন কেন? আশার কথা, শেষপর্যন্ত ভুল বুঝতে পেরেছেন তাঁরা। সংগঠনের জেনারেল প্রেসিডেন্ট বলেছেন, 'আই অ্যাম শকড্'। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিক্রিয়া— 'উই কনডেম অ্যান্ড ডিসোসিয়েন্ট ফ্রম দ্য কন্ট্রোভার্সিয়াল স্টেটমেন্টস।' চাপে পড়ে তাদেরকে সিদ্ধান্তও নিতে হয়েছে আগামী বছর থেকে বক্তাদের আগে থেকেই বক্তব্যের সারাংশ জমা দিতে হবে। মডারেটরদেরও দায়িত্ব থাকবে আলোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক হয় কি না তা নিশ্চিত করা।

কিন্তু, এসব অনভিপ্রেত বক্তব্য কি শুধু ওই দুই আমন্ত্রিত বক্তারই ছিল? মূল বিষয়ভিত্তিক একটি সেশনেও এরকম

হয়েছে। যেখানে আগেই সারাংশ জমা দেবার রীতি। এরকম উদ্ভট উপস্থাপন করেছেন পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের জিওলজি বিভাগের অধ্যাপক আশু খোসলা। রীতিমতো গবেষণালব্ধ তথ্য (!) হিসেবেই বলেছেন তিনি— 'ডাইনোসর প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা।' যুক্তি প্রমাণও (?) দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, ভারতে ডাইনোসরদের অস্তিত্বের নাকি যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষ নাকি একসময় চারণভূমিও ছিল ডাইনোসরদের। তাঁর মতে একসময়ে এই দেশে 'রাজাসোরাস' নামের ডাইনোসরদের দেখা মিলত। এই ভারতীয় ডাইনোসরদের নিবাস-স্থল ছিল গুজরাতের খেড়া জেলা। তিনি বলেন, গুজরাতের নদী সংলগ্ন এলাকায় এই ডাইনোসরদের দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। তাঁর দাবি, ব্রহ্মাই প্রথম এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে 'বেদ'-এ উল্লেখ করে গেছেন। তিনি আরো বলেন— 'ডাইনো' শব্দের অর্থ 'ভয়ানক', এসেছে ভারতীয় 'ডাইন' বা 'ডাইনি' থেকে। ধার করে নিয়ে গেছে বিদেশিরা। 'সর' শব্দটি নেওয়া হয়েছে ভারতীয় শব্দ 'অসুর' শব্দ থেকে।

এসব উদ্ভট তত্ত্ব ও তথ্যের পরিবেশনার জন্য বিজ্ঞানীরা, বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন সংগঠন, বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। ধিক্কার জানিয়েছেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী সি এন আর রাও নিন্দা জানিয়েছেন। অধ্যাপক বিকাশ সিন্‌হা দ্য টেলিগ্রাফের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন— 'আই রিকোয়েস্ট অল মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড কলিগস টু রাইজ টু দ্য অকেশন।'

প্রথা অনুসারে এবারেও বিজ্ঞান কংগ্রেসে উদ্‌বোধনী ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কী বলেছেন তিনি? উত্থাপন করেছেন ইনোভেশন— স্টার্ট আপ — বিজনেস ইনক্যুবেটর— আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স— ক্লিন এয়ার— অ্যাফোর্ডেব্‌ল হেল্‌থ কেয়ার প্রসঙ্গগুলো। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দুটো উদ্দেশ্যের কথাও বলেছেন। জ্ঞান-অর্জন এবং তাকে কাজে লাগিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। কিন্তু না, একটি কথাও বলেননি তিনি 'বিজ্ঞানমনস্কতা' বা 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ' নিয়ে, যা এ সময়ের ভারতবর্ষে সবচেয়ে জরুরি বিষয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী, অটলবিহারী বাজপেয়ির প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান কংগ্রেসের সঙ্গে যার ছিল বেশি সম্পৃক্ততা সেই জওহরলাল নেহরু প্রসঙ্গ আনেননি, যার 'বৈজ্ঞানিক মেজাজ'-এর সওয়াল সর্বজনবিদিত। যার উৎসাহ আর তত্ত্বাবধানেই এ দেশে বিজ্ঞানের কিছু অসামান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠা, নিতান্ত অল্প সময়েই ভারতকে, ভারতের বিজ্ঞানচর্চাকে বিশ্বের মানচিত্রে সম্মানের আসনে বসানো। নিন্দুকেরা মনে করেন, খুব সম্ভবত নেহরুর ভারত-ভাবনাকে ছারখার করে এক সমূহ সর্বনাশের পথে দেশকে নিয়ে যাবার যে কর্ম-পরিকল্পনা এখন, সেজন্যই নেহরু রইলেন অনুচ্চারিত।

যাই হোক, প্রধানমন্ত্রী অবশ্য স্মরণ করেছেন এ দেশের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র, সি ভি রামন, মেঘনাদ সাহা আর সত্যেন বসুকে। কেন? তাঁরই ভাষায় 'মিনিমাম রিসোর্সেস, বাট ম্যাক্সিমাম স্ট্রাগলস'— এর উদাহরণ। কিন্তু বলেননি, কী লক্ষ্য আর আদর্শকে সামনে রেখে তাঁদের বিজ্ঞানচর্চা। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথেরই ভাষায়— 'যখন আমরা ছাত্র ছিলাম তখন মনের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল, যে বিজ্ঞানের চর্চা করে পশ্চিম এত উন্নতি করেছে, আমাদের দেশে শীঘ্র চালু হবে এবং আমরা জীবন উৎসর্গ করব সেসব জিনিষ দেশের মধ্যে আনতে।' লক্ষণীয়, পশ্চিমের প্রতি ঘৃণা নয়, পশ্চিমের বিজ্ঞানকে খাটো করা নয়, বরং স্বীকার করা। নিজেদের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা, পশ্চিম থেকে অর্জনের কথা বলা। নিন্দুকেরা মনে করেন সম্ভবত চলমান হিন্দুত্ববাদী ভার্সানে এসব 'দেশদ্রোহ' বলেই প্রধানমন্ত্রীর উচ্চারণে আসেনি। কিন্তু উচ্চারিত হলে নতুন প্রজন্মের বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহেই অনুপ্রাণিত হতেন।

আধুনিক জ্যোতিপদার্থবিদ্যার জনক, নাক্ষত্রিক ঔজ্জ্বল্যসম্পন্ন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার কথা বলেছেন। নিঃসন্দেহে তা আমাদের ভালো লাগার কারণ। কিন্তু তিনি এটাও যদি বলতেন যে, ওই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর বহুখ্যাত এক ব্যাঙ্গার্থক নিবন্ধ আছে 'সবই ব্যাদে আছে', যদি বলতেন তথাকথিত 'বেদের বিজ্ঞান' নিয়ে রয়েছে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ গভীর পর্যবেক্ষণ, তাহলে আমরা আরো খুশি হতাম। মেঘনাদ সাহা এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আপনারা দাবি করছেন যে বর্তমান অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের গবেষণা বেদেই আছে; এক্ষেত্রে আপনাদের সুবিধা হলো অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা বেদ দুইয়ের কিছুই আপনাদের জানা নেই; পক্ষান্তরে আমার অসুবিধা এই যে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ও বেদ উভয়ই আমি যথেষ্ট চর্চা করেছি; তবে বেদের দোহাই দিয়ে হাবিজাবি কোন কথাই আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।' সম্ভবত একথা স্মরণে এলে, যে প্রকল্পে বিজ্ঞান কংগ্রেসের মঞ্চটাকে কলঙ্কিত করা, সে প্রকল্পটাই নিন্দিত হয়। তাই স্মরণে অনীহা।

যারা এমনসব কাণ্ডকারখানা ঘটাচ্ছেন তাঁরা এসব জানেন না, বোঝেন না তা নয়। তবু করছেন বিশেষ উদ্দেশ্যে। যুক্তরাজ্য নিবাসী ভারতীয় বিজ্ঞান লেখিকা অ্যাঞ্জেলা সাইন মন্তব্য করেছেন— নাৎসি জার্মানির মতো নিজেদের ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই দেশে তথাকথিত হিন্দুত্বের গর্ব উসকোবার জন্যই এসব কাজকর্ম। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়াতে ৮ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকা তাদের 'বিজ্ঞানবধ পালা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লিখেছে— 'কাহাকে বিজ্ঞান বলে, আর

কাহাকে ইতিহাস — দেশবাসীকে তথা ভুলাইয়া দিবার জন্য যে ব্যাপক হিন্দুত্ববাদী আয়োজন চলিতেছে, তাহার মূল্য সম্ভবত ভারতকে একাধিক প্রজন্ম ধরিয়া বহন করিতে হইবে।'

আশার কথা, বিজ্ঞানজগতের মধ্যেও কেউ কেউ এই প্রকল্পে নিজেদের সমর্পণ করলেও, কেউ কেউ ভয়ে চুপ থাকলেও, কেউ কেউ কর্তাভজা হয়ে প্রসাদ পাবার লোভে 'রাজা যত বলে, পারিষদগণ বলে তার শতগুণ' অনেকেই প্রতিবাদ করছেন, ধিক্কার দিচ্ছেন। নতুন প্রজন্মও সোচ্চার হচ্ছে ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে, গবেষণাগারগুলোতে। এমনকী বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে শিশুবিজ্ঞান আসরে সেসব আমন্ত্রিত বিজ্ঞানী(!)রা উদ্ভট কথা উচ্চারণ করেছেন, সেখানে অংশ নেওয়া শিশুবিজ্ঞানীরা, তাদের গাইড শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রশ্নে প্রশ্নে বিদ্ধ করেছেন বক্তাদের। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। তবে আনন্দবাজারেরই ভাষায়— 'বিজ্ঞানীদের বাহিরে যে বৃহত্তর নাগরিক সমাজ, তাহারও বিরাট দায়িত্ব' এবং 'প্রতিবাদ কেবল মৌহূর্তিক বিষয় নয়। প্রতিবাদ একটি ধারাবাহিক প্রতিঘাত না হইলে কাজ হয় না। একমাত্র তবেই গণেশ মার্কা গালগল্পকে বিজ্ঞানের গণ্ডির বাহিরে বহিষ্কার করা সম্ভব। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মুখোশধারী অবিজ্ঞানের মধ্যে যুদ্ধটি অত্যন্ত গুরুতর, ইহার গতি-প্রকৃতি ও ফলাফল নির্ভর করিতেছে প্রতিবাদীদের কর্মকাণ্ডের উপরই।'

দারিদ্র্য যেখানে পণ্য

নিখিলরঞ্জন গুহ

নতুন নতুন প্রতিশ্রুতি এখন মাঝেমধ্যেই খবরের কাগজের শিরোনাম নিতে শুরু করেছে। দিন দিন এর বৃদ্ধিও ঘটবে। লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই নিত্যনতুন প্রকল্প এবং প্রতিশ্রুতির কথা শোনা যাবে। ইতিমধ্যে প্রাক্-নির্বাচনী বাজেট ঘোষিত হয়েছে। অনৈতিক এই বাজেটের ঘোষিত প্রকল্প রূপায়ণের দায় পরবর্তী সরকারের। তাই এটা স্বাভাবিকই ছিল যে এই বাজেটে চমক থাকবে। একটা উদাহরণ থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। গ্রামীণ মোট ৮টি প্রকল্পের বরাদ্দ এই বাজেটে হ্রাস পেয়েছে (২০১৮-২০১৯ বরাদ্দকৃত অর্থ ১,০৯,৯৯২ কোটি বাদ সংশোধিত খরচ ৯৮,১৬৩ কোটি) = ১১,৮২৯ কোটি টাকা (আ.বা.প., ৩/২/১৯)। প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ বর্তমান শাসকদলের কাছে এটা পরিষ্কার যে সাধারণ মানুষকে ধর্মের নামে বা রামমন্দিরের নামে বিভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। সদ্য সমাপ্ত গোবলয়ের তিনটি রাজ্যের নির্বাচনের ফলাফল থেকেই এটা পরিষ্কার। তাই আরো বড়ো ধাপ্পা অপেক্ষা করছে এই বাজেটে। লক্ষ্য ক্ষমতা দখল। দেশের সংবিধান এ দেশে ফকির থেকে আমির প্রত্যেককেই একটা করে ভোট দানের ক্ষমতা দিয়েছে। দেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে আমিরেরা নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে অবস্থান করলেও তাঁদের মাত্রাছাড়া উচ্চাভিলাষ আরো নিরাপত্তা দাবি করে। ঐতিহ্যগত কারণেই বুর্জোয়া দলগুলির উপর এই দায় বর্তায়। গরিব মানুষের সংখ্যা এই দেশে নেহাত কম নয়। আর বি আই-এর প্রাক্তন গভর্নর সি রঙ্গরাজনের রিপোর্টে গ্রাম ও শহরের মাথাপিছু আয় চিহ্নিত হয়েছিল যথাক্রমে ৩৩ টাকা এবং ৪৭ টাকা। এই তথ্য থেকে এই সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। প্রায় ৬৪,৯৪৮১ (২০১১) গ্রামে বসবাসকারী প্রায় ৮৩ কোটি (৬৮.৮৪ শতাংশ) মানুষের সিংহভাগই ছোটো কৃষি পরিবার অথবা প্রান্তিক কৃষক। ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে এই বিপুল জনসমষ্টির ভূমিকাকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। এর সঙ্গে খেতমজুর এবং বর্গাদারদের যুক্ত করলে সেই সংখ্যাটা আরো বড়ো হবে সন্দেহ নেই। কৃষি ব্যবস্থার সঙ্গে এই অংশের স্বার্থও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই ভোট রাজনীতির কারবারিদের কাছে এই অংশের গুরুত্বও অপরিসীম। এই অংশের দারিদ্র্যই এই কারবারিদের বড়ো ভরসা। গণতন্ত্র কেনা-বেচার বাজারে দানখয়রাতি-নির্ভর অসহায় মানুষগুলির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকে। করুণানির্ভর জীবন রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিপন্থী বহু পরীক্ষিত এই সত্য এই সকল বেনিয়াদের প্রধান পুঁজি। তাৎক্ষণিক সুবিধা দানের বিনিময়ে এই দারিদ্র্যকে কিনে নিতে এই কারবারিদের তাই তৎপর হয়ে উঠতে দেখা যায়। সামর্থ্যের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান থাকায় এই প্রশ্নেও এই অংশের মানুষ অনেকটাই পিছিয়ে। মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার লুঠেরাদের কৌশলের কাছে তাই অনেক সময়েই এই সকল অসহায় মানুষকে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়। যে সুবিধা এবং স্বপ্ন এই মানুষদের বোকা বানায় তা যে তাঁদের লুণ্ঠনজাত ফলেরই ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বিশেষ তা বুঝে ওঠার অক্ষমতার কারণ থেকেই এমনটা ঘটে। শুধু যে গ্রামের ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায় তা নয়, শহরের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়ে থাকে। ৭৯৯৫(২০১১) শহরের(১০০-৬৮.৮৪)=১৩.১৬ শতাংশ শহরবাসীর একটা বড়ো অংশই কর্মহীনতার শিকার। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেখা গিয়েছে এই অংশ ভারতীয় জনতা পার্টিকে ব্যাপক সাফল্য এনে দিয়েছিল। বছরে দুই কোটি কর্মসংস্থানের স্বপ্ন হতাশাগ্রস্ত বেকার যুবক-যুবতীদের বিভ্রান্ত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। পরিবার পিছু ১৫ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি যেমন গরিব মানুষকে প্রভাবিত করেছিল তেমনি মধ্যবিত্তসহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষও কালো টাকা উদ্ধারের বিষয়টিকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখেছিল। অচ্ছে দিনের স্বপ্নকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার প্রশ্নে মোদীর সাফল্যকে অস্বীকার করা যায় না। মেক ইন ইন্ডিয়া স্লোগানটিতে যেমন ছিল নতুনত্ব তেমনি সবকা সাথ সবকা বিকাশ স্লোগানটির মধ্যেও ছিল ব্যঞ্জনা যা অনেক মধ্যবিত্ত মানুষকেও বিভ্রান্ত করেছিল।

নির্বাচনোত্তর সময়ে দেখা গিয়েছে এই প্রতিশ্রুতিগুলি ছিল

ভিত্তিহীন এবং বিভ্রান্তিমূলক। ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষকদের আয় হ্রাস, বিনিয়োগে শ্লথগতি দেশের অর্থনীতিকে এক বিপদজনক খাদের কিনারায় এনে দাঁড় করিয়েছে। সারা দেশে কৃষকদের বিক্ষোভ, দেশব্যাপী শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের ধর্মঘটে তাঁর প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। বিপুল অঙ্কের ব্যাঙ্ক প্রতারণা এবং বৃহৎ পুঁজির মালিকদের নেওয়া ব্যাঙ্কঋণজনিত কারণে সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান অনুৎপাদক সম্পদের চাপে ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে তাতে সাধারণ আমানতকারীরা বিপন্ন। অর্থনীতিতে এই অরাজকতা বৃহৎ পুঁজির মালিকদের বেপরোয়া হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সুইজারল্যান্ডে দাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক রিপোর্টে যে ছবি ফুটে উঠেছে তা এককথায় ভয়ংকর। ওই ফোরামে প্রকাশপ্রাপ্ত অক্সফ্যামের রিপোর্ট (২০১৭) থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে নীচে উল্লেখ করা হল।

মোট জনসমষ্টির শতাংশ	অধিকৃত জাতীয় সম্পদের অংশ	সম্পদ বৃদ্ধির হার	দৈনিক আয়
৬০ শতাংশ	৪.৮ শতাংশ	*	**
১ শতাংশ	৭৭ শতাংশ	৩৯ (২০১৮)	২,২০০ কোটি

* এখানে উল্লেখ্য দেশের নিম্ন আয়ভুক্ত জনসমষ্টির ৫০ শতাশের সম্পদ বৃদ্ধির হার মাত্র ৩ শতাংশ।

** সি রঙ্গরাজনের রিপোর্টকে ভিত্তি ধরলে বি পি এল তালিকাভুক্ত দেশের প্রায় ২২ শতাংশের দৈনিক আয় মাত্র ৩৩ টাকা (গ্রামে) এবং শহরে ৪৭ টাকা।

সবকা সাথ সবকা বিকাশ যে কত বড়ো ভাঁওতা ছিল তা সম্পদের এই অসম বণ্টন থেকেই স্পষ্ট। কার্যকর চাহিদা সৃষ্টির অন্তরায় এই বিপুল জনসমষ্টি শুধু যে নতুন বিনিয়োগের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই নয় শ্রমের বাজারেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে যেখানে দেশে মোট কর্মীসংখ্যা ছিল ৪.০৭৯ কোটি, ২০১৭-২০১৮-য় তা নেমে দাঁড়িয়েছে ৩.০৭০ কোটিতে। অর্থাৎ কাজ হারিয়েছে ১ কোটি ৯ লক্ষ মানুষ। মনে রাখতে হবে দেশের বেকার বাহিনীতে প্রতিবছর মোট জনসংখ্যার একটা নির্দিষ্ট হারে কর্মহীন যুবক-যুবতীর সংখ্যা যুক্ত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নতুন করে কাজ হারানো এই সংখ্যা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। বিপজ্জনক দিক হল দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত মোট শ্রমজীবী মানুষের ৯৪ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি ঠিকাদারি সংস্থার অধীনে কর্মরত। এই অংশ শুধু যে নানা সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাই নয় এরা শ্রমমূল্য এবং কাজের নিরাপত্তাহীনতারও শিকার। পাঁচ বছরে দশ কোটি কর্মসংস্থানের বিষয়টি যে কত বড়ো রসিকতা ছিল তা সবকা সাথ সবকা বিকাশের পাঁচ বছরের মাথায় আজ স্পষ্ট। মেক ইন ইন্ডিয়ার বর্তমান ভারত মেক ইন চায়না পণ্যে কোণঠাসা। বর্তমান সরকারের বিগত বছরগুলির পদক্ষেপগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে দেশের গরিব ও সাধারণ মানুষ যখন ক্রমশই কোণঠাসা হয়েছে তখন কর্পোরেট হাউসগুলির বাড়বাড়ন্ত ঘটেছে ব্যাপকভাবে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি। বিতর্কিত রাফায়েলকে কেন্দ্র করে ওঠা প্রশ্নগুলিকে কখনোই উপেক্ষা করা যায় না। এই প্রশ্নগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্তও বটে। ইউ পি এ আমলে পাইপ লাইনে থাকা চুক্তিতে বিমান বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির স্বার্থে ১২৬ উন্নত মানের যুদ্ধবিমান কেনার কথা থাকলেও মোদীর হস্তক্ষেপে ফ্রান্স থেকে ৩৬টি বিমান কেনার কথা বলা হয়েছে। আশ্চর্যজনকভাবে বিমানপ্রতি মূল্য পূর্ব মূল্যের কয়েক গুণ বেশি ধরা হয়েছে। অনিল আম্বানির সদ্য প্রতিষ্ঠিত সংস্থাকে ৩০ হাজার কোটি টাকা পাইয়ে দেওয়ার ফলেই এই মূল্যবৃদ্ধি। কারণ কোনো মধ্যবর্তী সংস্থাকেই কোনো ব্যবসায়ী নিজের পকেট থেকে টাকা দেয় না। ক্রেতার কাছ থেকেই সে তা আদায় করে থাকে। ভারত সরকারকেই এই অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়েছে। হ্যালের মতো সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাকে বাতিল করে অনিল আম্বানির সংস্থাকে এই সুযোগ দেওয়ার মধ্যে কোনো দুর্নীতি ছিল না, একথা বলা যাবে না। বরং বলা যায় এর দ্বারা সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গেও আপোশ করা হয়েছে। ৫০ লক্ষ কৃষি পরিবারকে স্বাস্থ্য বিমার নামে হাজার হাজার কোটি টাকা বেসরকারি বিমা সংস্থাগুলির হাতে তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্যও স্পষ্ট। নানা শর্তপূরণ সাপেক্ষে গরিব ও পশ্চাদ্‌পদ কৃষকদের পক্ষে এই সুযোগ নেওয়া আদৌ সম্ভব কিনা তা ভেবে দেখার দাবি রাখে। এই টাকা সরাসরি গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে খরচ করা হলে এই সংস্থাগুলির পকেটে টাকা না ঢুকলেও গরিব মানুষেরা উপকৃত হত বেশি। কৃষি বিমার ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। শুধুমাত্র এই রাজ্য থেকেই গতবছর অনিল আম্বানি গোষ্ঠী কয়েক শত কোটি টাকা হাতিয়ে নিতে পেরেছে। আপাতভাবে এই প্রকল্পগুলিতে চমক থাকলেও মূলত এর দ্বারা লাভবান হয়েছে বেসরকারি বিমা সংস্থার মালিকেরা। কৃষিতে উৎপাদনের উপকরণগুলিতে ভরতুকি হ্রাস না করে যদি তা বৃদ্ধি করা হত এবং প্রাকৃতিক কারণে সংগঠিত ক্ষতি পূরণের জন্য সরকার যদি নিজস্ব মাধ্যমকে কাজে লাগাত তবে কৃষিতে এই বিপর্যয় দেখা দিত না। নোটবন্দিতে যেমন অসংগঠিত ক্ষেত্রে মানুষ ব্যাপক কাজ হারিয়েছে তেমনি কালো টাকার মালিকেরা তাঁদের কালো টাকাকে সাদা করার সুযোগ পেয়েছে। নোবেলজয়ী ড. অমর্ত্য সেন এবং অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ এটাকে হঠকারী সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন। মনে রাখতে হবে ৫০০ এবং ১০০০ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিতে কোনো কোটিপতিকে লাইনে দাঁড়াতে হয়নি। আরবিআই-এর

দেওয়া তথ্য থেকেই এটা স্পষ্ট যে প্রায় ৯৯ শতাংশ টাকাই সাদা হয়ে ব্যাঙ্কে ফিরে এসেছে। বাংলাদেশ, নেপাল এবং বিদেশে পড়ে থাকা টাকা ধরলে ফিরে না আসা কালো টাকা আরো কম হবে। এই প্রশ্নে মোদীর প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই ছিল অসত্য এবং বিভ্রান্তিকর। জিএসটি লাগুর প্রশ্নেও ছোটো ব্যবসায়ীরা ভীষণভাবে ক্ষতির মুখে।

তবুও বর্তমান শাসকদলের পক্ষে ক্ষমতায় ফিরে আসার বিষয়টিকে হালকা করে দেখা ঠিক হবে না। ইতিমধ্যে সরকারি কোষাগার থেকে বিপুল অর্থ ব্যয়ে মোদীর সচিত্র বিজ্ঞাপন প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। ব্যাবসার কারণে বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিভাজনের রাজনীতির সাফল্য নিয়ে চিন্তিত শাসকদলের হাতে বিকল্প বলতে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা ছাড়া কোনো পথ খোলা নেই। ইতিমধ্যে উচ্চবর্ণের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। সমাজের একটা বড়ো অংশকে ভোটবাক্সে টেনে আনার জন্য এটা একটা প্রয়াস মাত্র। যদিও এটার বৈধতা নিয়ে সংশয় বর্তমান তথাপি এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে-পড়া উচ্চবর্ণ বলতে সরকার যাঁদের চিহ্নিত করেছে তাঁরা আদৌ পিছিয়ে-পড়া অংশ কি না। বাৎসরিক ৮ লক্ষ বা মাসিক ৬৬,৬৬৬ টাকা উপার্জনক্ষম পরিবার বা ৫ একর জমির মালিক অথবা ১০০০ বর্গফুট ছাদযুক্ত বাড়ির মালিকদের এই অংশ হিসেবে এই বিলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিপিএল তালিকাভুক্ত জনসমষ্টির ২২ শতাংশ বা নিম্নবিত্ত মানুষেরা এর ফলে কতটা উপকৃত হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কর্ম সংকোচনজনিত কারণে এই সুযোগ কতজনের জুটবে সেটাও একটা বড়ো প্রশ্ন। এখন আরো নানা ঘোষণা এবং প্রতিশ্রুতির জন্য দেশবাসীকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে বিগত বছরগুলির অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে তা বিবেচিত হওয়া আবশ্যক। অন্যথায় দেশের অর্থনৈতিক জীবনই যে শুধু বিপন্নতার মুখে পড়বে তাই নয় দেশের সংহতি এবং সাংবিধানিক চরিত্রের উপরও আঘাত আসার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তবে সঙ্গে এটাও মনে রাখা জরুরি যে ভোটের বাজারে গণতন্ত্রের অসহায়তা এই রাজ্যেও দিন দিন প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতীদের অভিশপ্ত বেকার জীবনের মুক্তির কথা না ভেবে নির্বাচনে তাঁদের বাহিনী হিসেবে নামানোর লক্ষ্যে ক্লাবগুলিকে অনুদান দেবার মধ্যে আর যাই থাক তা যে তাঁদের জীবনযন্ত্রণাকে ভুলিয়ে রাখার একটা কৌশল মাত্র সেটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের শিক্ষক ঘাটতি স্কুলগুলিতে প্রস্তাবিত এন্টার্নশিপের নামে ২০০০/২৫০০ টাকায় মেধা শোষণের মধ্যেও একই উদ্দেশ্য বর্তমান। এই নিষ্ঠুর রসিকতায় বিভ্রান্তিতেও বিপদের আশঙ্কা বর্তমান। মুখ্যমন্ত্রীর দল পরিচালনার প্রশ্নে ফ্যাসিবাদী ঝোঁক সরকার এবং জনগণের অধিকারকে ক্রমশই সংকুচিত করছে। তাই আগামী নির্বাচনে গণতন্ত্রকে ব্যবহারের প্রশ্নে যেকোনো ভুল এবং ভ্রান্তি রাজ্য ও দেশ উভয় ক্ষেত্রেই বিপদ ডেকে আনার সম্ভাবনা রাখে।

সংবিধান ও জনগণের অবমাননা আর কতদিন?

বরুণ কর

ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের প্রাক্কালে মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি এই মত পোষণ করে যে সার্বিক ভোটাধিকারের প্রশ্নে শিক্ষার অভাব কখনোই অন্তরায় হয়ে উঠতে পারে না। তাঁরা মনে করতেন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত করে। গণপরিষদের মূল শক্তি জনগণ এই কথা বিশ্বাস করতেন স্বয়ং নেহরুও। সংগত কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংখ্যালঘু-অধিকার সম্বলিত সুসংহত তালিকার সঙ্গে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের প্রশ্নটি যুক্ত হয় এবং জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের লক্ষ্যে ভারতীয় সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি যাত্রা শুরু করে প্রায় সাতটি দশক পেরোনোর অপেক্ষায়।

গণতান্ত্রিক আদর্শকে বিশেষ মান্যতা দিয়ে সব ধরনের মতামত প্রকাশের উপযুক্ত পরিসর নির্মাণে সংবিধান প্রণেতাদের আগ্রহ সত্ত্বেও, পরিতাপের বিষয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাসককুলের সক্রিয়তায় আবার কখনো অভিসন্ধিমূলক নিষ্ক্রিয়তায় গণতন্ত্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভীষণভাবে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য সংবিধান পরিবর্তন— এই ধরনের মন্তব্য করে এক মন্ত্রীকে এমনকী পার্লামেন্টে দুঃখপ্রকাশ পর্যন্ত করতে হয়েছে। কিন্তু ওইটুকুই। বিজেপি-র দিকে আঙুল উঠলেও জাতীয় কংগ্রেস নামক দলটি যে এ ব্যাপারে খুব বেশি পিছিয়ে তা বলা যাবে না। একথা ভুললে চলবে না সংবিধান প্রচলিত হওয়ার পঁচিশ বছরের মধ্যে জনসাধারণের কণ্ঠরোধে দলটিকে জরুরি অবস্থা জারি করার মতো ঝুঁকি নিতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের যেকোনো উচ্চারণ তখন ছিল নিষিদ্ধ। সেই রোষে বাদ পড়েননি রবীন্দ্রনাথও। এতসব কাণ্ড কারখানার নেপথ্যে যে কারণ তা হল নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা ছুটিয়ে গদিতে আসীন হওয়া মাত্র তা বিস্মৃত হওয়া— যা এখন অধিকাংশ দলের প্রায় রেওয়াজে পরিণত।

মৌলিক কিছু দাবি নিয়ে গত মার্চ মাসে নাসিক থেকে মুম্বই পদযাত্রায় পা মেলায় চল্লিশ হাজার কৃষক। তাদের সঙ্গে শামিল আরো দশ হাজার সাধারণ মানুষ। সারা দেশের রাজনীতিতে এই পদযাত্রা আলোড়ন ফেলে দেয়। খবরের কাগজে কৃষকদের আত্মহত্যা ও মৃত্যুর ঘটনা নজরে এলেও রাজনীতিকদের কানে পর্যাপ্ত জল না ঢোকায় এই আয়োজন। সাড়া ফেলে দেওয়া এই কর্মসূচির জন্য বামপন্থী কৃষক সংগঠনগুলোকে বাহবা দিতে হয়। কিন্তু এতে আহ্লাদিত হয়ে পড়লে বিপদ আছে। বিশিষ্ট সাংবাদিক পি. সাইনাথ এক সাক্ষাৎকারমূলক আলোচনায় মন্তব্য করেছেন, '...সংসদ ভালো হবে না খারাপ হবে সেটা আমাদের ওপর নির্ভর করবে।' প্রশ্ন তুলেছেন, '...একজন নাগরিক হিসাবে আপনি কি চান যে সাধারণ মানুষের কাজ করানোয় সংসদকে বাধ্য করতে?' এখানে এসে যায় জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ। এই প্রশ্নে আলোচনা যত কম হয় ততই মঙ্গল। প্রতীচী ট্রাস্টের উদ্যোগে এ রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, সরকারি নির্দেশনামা অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থীর বাসস্থান এবং তার বিদ্যালয়ের আদর্শ দূরত্ব হওয়া উচিত গ্রামাঞ্চলে এক কিলোমিটার এবং শহরাঞ্চলে আধ কিলোমিটার। কিন্তু অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলে। কারণ দূরত্বের বিষয়টি নির্ভর করে মূলত জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর। এ ছবি সর্বত্র। এলাকার প্রয়োজন নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের মাথা ঘামাতে বয়েই গেছে। কয়েক মাস আগে রাজস্থানের জয়পুরে 'দশম' নামে এক উদ্যোগ সংবাদমাধ্যমের নজর কাড়ে। আগামী দু-তিন বছরে ভোটাধিকার অর্জন করবে এমন দু-শো জন পড়ুয়া সাতটি ওয়ার্কশপে তাদের প্রয়োজনীয় দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা করে। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আবেদন জানানো হয় তারা যেন দাবিগুলি দলীয় নির্বাচনী ইস্তাহারে অন্তর্ভুক্ত করে। যোধপুরের আমিরা খাতুন (১৭) জানায় সে যে গ্রামে থাকে, সেখানে না আছে কোনো হাসপাতাল, না আছে কোনো স্কুল। কুন্দন কুঁয়ার নামে এক শিক্ষার্থী জানায় 'Career' কী জিনিস সে সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী ছাত্রদের কোনো ধারণা নেই। শিক্ষার প্রসার কী বস্তু মেয়েরা জানেই না। একরকম জোর করে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় বিয়ের পিঁড়িতে।

কংগ্রেসের অপদার্থতায় ১৯১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি

বিপুল গরিষ্ঠতা নিয়ে দিল্লির মসনদে আসীন হয়। কিন্তু দেশজোড়া দুর্নীতির রমরমা, অবাধ বেসরকারিকরণ, ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের জ্বালা, সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, রামমন্দির, গো-মাংস, অসহিষ্ণুতা— এইসব নিয়ে বিজেপি শাসনের অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। বিপর্যয় এতটাই যে প্রধানমন্ত্রীর নাটুকেপনাতেও আর লোক ভোলানো যাচ্ছে না। আসরে তাই কংগ্রেসের পুনরাবির্ভাব। একজনের গায়ে যদি রাফাল দুর্নীতি তো অন্যজনের গায়ে অগাস্টা কপ্টারের কালিমা। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনে ভারতীয় জনসাধারণের যেন কোনো অধিকার থাকতে নেই। এরই মধ্যে যেটুকু বলার তা হল প্রথম ইউপিএ-র (বামপন্থীদের সমর্থনপুষ্ট) শাসনকাল জনজীবনের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও স্বস্তিদায়ক ছিল। কিন্তু সে সুখ সইবে কেন! আমেরিকার তল্পি বইতে গিয়ে কংগ্রেসকে বামপন্থীদের আস্থা হারাতে হয়। দেশ ও জনগণের সার্বিক চেহারা নিয়ে শাসককুলের বাগাড়ম্বর ও যুযুধান পণ্ডিতদের আঁক কষায় কোনো বিরাম নেই। চার বছর আগে ক্ষমতালাভ করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদীর মনে হল পরিকল্পনা কমিশন দেশের উন্নতিসাধনে যথেষ্ট সাফল্যলাভ করতে পারেনি। কমিশনের জায়গায় এল নীতি আয়োগ। নীতি আয়োগের হাত ধরে আবার একচোট সংস্কারের আয়োজন। শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যাঙ্ক ও বিমা ব্যাবসাসহ, রেল ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে বেসরকারি মালিকদের পৌষ মাস। এর ফল যা হবার তাই হয়েছে। পুঁজির স্বার্থ দেখতে গিয়ে জনজীবনে নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, সংখ্যালঘু দলিত-জনসাধারণের বৃহদংশ আজ নানা নিপীড়ন, উৎপীড়নের শিকার।

মজার ব্যাপার, ইদানীং কৃষকদের দুর্দশায় বিভিন্ন রাজ্যে শাসককুলের মধ্যে চোখের জলের প্রতিযোগিতা দেখা যাচ্ছে। আসলে তারা বিলক্ষণ বুঝতে পারছে কৃষকদের মেজাজ কোন তারে বাঁধা। এই সার সত্যটি বুঝে বামপন্থীদের উচিত এখনই কোমর বেঁধে নেমে পড়া। সর্বস্তরের মেহনতি মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রক্রিয়া শুরু করা গেছে, তা আরো মজবুত হোক। শুরু হোক শাসকশ্রেণির কাছ থেকে জবাবদিহি চাওয়ার প্রক্রিয়া। জন-স্বার্থবাহী কর্মসূচির তালিকা নিয়ে এখনই তৈরি হোক নির্বাচনী অ্যাজেন্ডা। প্রকাশিত হোক সে অ্যাজেন্ডা জনসমক্ষে। কে বা কারা সেই অ্যাজেন্ডার পক্ষে বা বিপক্ষে জনগণ সুযোগ পাক তা বুঝে নেওয়ার। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। দেশের জনসাধারণের দুর্গতির অবসান হোক— বামপন্থীরা সত্যি যদি চান, তাহলে প্রশ্ন তোলা শুরু হোক এখনই। ফসলের ন্যায্য দাম থেকে কৃষককুল কেন বঞ্চিত হবেন। কেন স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর পেরিয়ে এলেও শ্রমিক পাবে না তার ন্যূনতম মজুরি। কোন স্বার্থপূরণের লক্ষ্যে রাষ্ট্রক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণ। শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকার আজও কেন অবহেলিত। দুষ্টের দমন যদি শাসকের উদ্দেশ্য হয় তবে কেন তদন্তের নামে ছেলেখেলার আয়োজন? একবিংশ শতকে পৌঁছেও 'হনুমান' কোন গোত্রভুক্ত তা নিয়ে চর্চার অবকাশ কোথায়? সব মানুষের খাওয়া-পরা, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা আদায় করার লক্ষ্যে উঁচু গলায় প্রশ্ন রাখতে হবে। শবরীমালা মন্দিরে সব বয়সের মহিলার প্রবেশাধিকার উচ্চতম আদালতে স্বীকৃতি পেলেও তা নিয়ে ধর্মীয় ভাবাবেগের আড়ালে কেন রাজনৈতিক হিংসা ছড়ানো হবে? কংগ্রেস দলকেও স্পষ্ট করতে হবে তাদের অবস্থান। রাজ্যস্তরেও প্রশ্ন জারি রাখতে হবে সারদা-নারদাসহ একাধিক তদন্ত কমিশনের ভবিষ্যৎ কী? কেন গরিব মানুষ তাদের লুট হওয়া টাকা ফেরত পাবে না? আসল অপরাধীদের শাস্তি হবে তো? উন্নয়নের নামে মিথ্যাচার চালানো হবে কতদিন? নারী-নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকার কেন নীরব? কেন্দ্রীয় নীতির বিরোধিতায় ডাকা ধর্মঘট ভাঙার খেলায় রাজ্যের শাসকদলের এত উৎসাহ কীসের? কর্মনাশা সংস্কৃতির পূজারি যখন কর্মসংস্কৃতির অছিলায় শ্রমিকবিরোধী তৎপরতা দেখায়, তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে না? জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কর্পোরেশন, মহকুমা পরিষদকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হবে কেন? পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্ব ছ-মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেন এখনও সর্বত্র বোর্ড গঠনে গড়িমসি? কেন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দল ভাঙিয়ে শাসকদলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করে দখল নেওয়া হবে পঞ্চায়েতসহ সমস্ত স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠানের? কেন শুধুমাত্র নির্বাচনের প্রাক্কালে ডানলপ, জেশপ, হিন্দমোটর-সহ বন্ধ কল-কারখানা খোলার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকের সঙ্গে করা হবে প্রবঞ্চনা?

কেরালা সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের আমন্ত্রণে এসে বস্তুবাদী সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ প্রফেসর জোনাথন ডলিমোর এক সাক্ষাৎকারে বলেন শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে গণপরিসরে সোচ্চারে সত্যি কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন। দুর্ভাগ্য আমাদের, এখানে সত্যি কথা বলার লোকের বড়ো আকাল। যাদের বলার কথা, তারা শাসকের হাতে তামুক খেতে বেশি পছন্দ করেন, তাতে ঝুঁকি কম। সত্যি কথা বলতে গেলে তাঁরা ঢোঁক গেলেন বেশি। এতে সত্যি হয়ে যায় মিথ্যা আর মিথ্যা অবলীলায় সত্যের স্থান দখল করে। বামপন্থীদের দায় ও দায়িত্ব তাই অনিবার্যভাবে বেশি। জনসাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে এখনই পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিতে হবে অন্য আর পাঁচটা দলের থেকে তারা কোথায় এবং কী কারণে আলাদা? সতর্ক থাকতে হবে তাদের যাতে জনগণকে তাদের কাছে আর প্রবঞ্চিত না হতে হয়। এ বিষয়ে অতীতের অভিজ্ঞতা যে খুব সুখকর তা ভাবা উচিত হবে না। স্বাধীনতা লাভের সত্তর বছর পরেও জনগণের প্রাপ্তির চেয়ে অপ্রাপ্তির পাল্লাটা তুলনায় অনেক ভারী। এ বড়ো কষ্টের। যে সংবিধানের নামে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা শপথ গ্রহণ করে থাকেন, জনসাধারণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গে সেই সংবিধান ও জনগণ উভয়েরই যে অবমাননা হয়— এ কথা বোধহয় বুঝিয়ে দেওয়ার সময় এসে গেছে।

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব: সেকাল ও একাল

স্বপনকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ ১৯০১ সালে মাত্র পাঁচ জন ছাত্র নিয়ে এক বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার পেছনে কবির মনে এক আদর্শবাদী শিক্ষাচেতনা ছিল। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার একটি অসামান্য দিক হল যে, শিক্ষাচর্চার চতুর্দিকে বিধি-নিষেধ ও প্রাচীর নির্মাণের প্রয়াসকে সূচনা থেকেই তিনি উধাও করে দিতে চেয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যাচর্চার যে সৃজন কল্পনা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তার তুলনা ভারতবর্ষে আর কোথাও ছিল না। বিদ্যাচর্চার মধ্যে আর একটা বড়ো দিক ছিল আশ্রমে আনন্দ পরিবেশের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রী-কর্মী-শিক্ষক ও সাধারণভাবে আশ্রমিকদের চিন্তা-ভাবনা, সৌন্দর্যবোধ এবং মানবিক চেতনাকে জাগ্রত করে তোলা। এসব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন দেখতেন।

এই স্বপ্ন আদর্শ অভিলাষকে রূপায়িত করবার অভিপ্রায়েই কবি শান্তিনিকেতনে নানান উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কবি ঋতু উৎসবের প্রবর্তন করেন। একালেও বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ধরনের উৎসব হয়ে আসছে। শান্তিনিকেতনে কবির আশীর্বাদে ও শুভেচ্ছায় বারো মাসে পার্বনের সংখ্যা তেরোরও বেশি। এইসব উৎসবের একটা মৌলিক দিক হল— প্রকৃতি ও মানুষের প্রাণমৈত্রী সেতু রচনার প্রয়াস। বিদ্যা, উৎসব, শিক্ষা, আনন্দ আর সৃজন কল্পনার নান্দনিকতা সব মিলেমিশে গড়ে উঠেছিল এক অনন্য পরিমণ্ডল।

বিভিন্ন ঋতুকে নিয়ে কবি-প্রবর্তিত এই উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— এই বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণে অনাবিল আনন্দের ধারাকে প্রবাহিত করা। এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেবার আগে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সম্পদ কবির হাতে খুব একটা ছিল না। ধীরে ধীরে নানান চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন উপায় কবি নিজেই খুঁজে পেয়েছিলেন। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সহকর্মীরা এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানকে আরো নিখুঁত ও সুন্দর করে তোলবার জন্য সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছিলেন।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, বিশিষ্ট লেখক ও রবীন্দ্র স্নেহধন্য প্রমথনাথ বিশী-র কথায় 'শান্তিনিকেতনের ঋতু-উৎসবের ক্রমবিকাশ এক অর্থে রবীন্দ্রজীবনের প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতর মিলনের ক্রমবিকাশ মাত্র।'

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব রবীন্দ্রনাথের রচনা ও পরিকল্পনা। ক্ষণস্থায়ী এই ঋতু কবিকে আকর্ষণ করত বিশেষভাবে। বর্ষার পরই তাঁর প্রিয় ছিল বসন্ত ঋতু। বহুযুগ ধরে ভারতবর্ষে দোলযাত্রা হয়ে আসছে। এই দোল উৎসবকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনে 'বসন্ত উৎসব' রূপে পালন করলেন।

রবীন্দ্রনাথ আনন্দ আবাহনের ঋতু বসন্তকে নানা রূপে নানাভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। কবি বসন্তের মধুমাস ফাল্গুনকে এক অন্য চেতনায় আমাদের অন্তরে স্থান করে দিয়ে গেছেন। ঋতুরঙ্গশালায় ফাল্গুন মোহময়ী আনন্দে অনুপমা।

এই শান্তিনিকেতনী বসন্তে আনন্দের নবীনতাকে যে কেউ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন। বসন্তের যে গান— তা ফাগুনের নবীন আনন্দে উদ্দীপ্ত করে তোলে হৃদয়কে। একারণেই বসন্ত হয়ে ওঠে বাউল— পথভোলা এক পথিকেরই মতন।

বসন্ত পূর্ণিমাকে নিয়ে কবি নাটক ও পালা রচনা করেছেন। কেবল তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে, নাটকে, চিঠিপত্রে অশোক-শিমূল-পলাশ-মাধবী-রক্তকরবী-বাসন্তী-বনপুলক যারা বসন্তের দূতী— এরা আজও অব্যাহত আসন নিয়ে আছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে, অজানা-অচেনা স্থানে অনাদৃত ফুলেরা থাকে বিকশিত হয়ে, রবীন্দ্রনাথ তাদের এক একটি নাম দিয়ে গান, কবিতা আর লেখার মধ্যে চিরস্মরণীয় আসন করে দিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনে 'বসন্ত উৎসব' প্রবর্তনের পর থেকেই নানান ধরনের লেখা ও রচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ মিলবে যে কবি এই উৎসবকে কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের লেখা অনেক

শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বসন্তোৎসবে রবীন্দ্রনাথ।

নাটকের পটভূমিকা বসন্তপূর্ণিমা। বেশ কয়েকটি পালাও তিনি রচনা করেছিলেন বসন্ত আবাহনে।

শীতের বিদায় আর বসন্তের আগমনে বাতাসের সুর যখন দক্ষিণে মোড় নেয় তখন অনেক ফুলের ডালি সাজিয়ে 'মাধবী' ফুলই কবিকে প্রথম ডাক দেয়। ফুলটি দেখতে সাদা রংয়ের, তার মাঝে একটু হলুদের আভা। এই ফুলটির গন্ধ খুবই সুন্দর। এই মাধবী ফুলটির পুষ্পিত হতে প্রথম দিকে যেন কেমন দ্বিধা থাকে। 'ঋতুরাজ' বসন্তকে স্বাগত জানাতে হঠাৎই মাধবীর আবির্ভাব। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন— 'হে মাধবী, দ্বিধা কেন?'

বনপুলক— এরা বসন্তের প্রথম দূতী। বনপুলকের স্নিগ্ধ ও সকরুণ গন্ধে সারা আশ্রম আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বসন্তের এই ফুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছেন— "... এখানকার লোকের কাছে তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলে বুনোফুল— নাম জানা নেই। আমরা সেই অনাদৃত ফুল জঙ্গল থেকে আনিয়ে কিছুকাল আগে বাগানে লাগিয়েছিলুম— এখন তার পুরস্কার পাচ্চি। সৌন্দর্যে ও সৌগন্ধ্যে বহুদূর পর্যন্ত কৃতজ্ঞতা বিস্তার করেছে। আমি এর নাম দিয়েছি 'বনপুলক'...।"

আমের মুকুলের মিষ্টি গন্ধের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতেই শালবীথির চত্বর ঢেকে যায় শালের মঞ্জরিতে। অল্পদিনের মধ্যে শিরীষের ফুল শেষ হলেও— ফলগুলি বাতাসের দোলা খেয়ে খেয়ে বসন্ত নৃত্যের তালে তালে নূপুরের নিক্বণে বেজে ওঠে। আনন্দময় পরিবেশে প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোকিল, দোয়েল, কাঠঠোকরা, পাপিয়া, ফটিকজল, মৌটুসীদের কুহু কুহু ডাক আর নানা মধুর শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

'রামধনু চাঁপা' ফুলকে কবি আদর করে নাম রেখেছিলেন— 'বাসন্তী'। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হেমন্তবালা দেবী-কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন— 'বাসন্তী ফুলের খবর জানতে চেয়েছো। ভাষায় বর্ণনা করে জানাবার উপায় নেই। একটি ফুল চিঠির মধ্যে পাঠালাম কিন্তু ডাকঘরের দলনে পিষ্ট হয়ে যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, তখন নিষ্ঠুর শাশুড়ীর পীড়নে অবসন্ন নববধূর মতো ওর পরিচয় ক্লিষ্ট হয়ে যথার্থ আত্মপ্রকাশ করতে পারবে না। বসন্তের প্রথম সমাগমের আমন্ত্রণে এই ফুল

আমার বাগানে গাছ ভরে উঠেছে— এর কচি পাতাগুলি সিন্দুর বরণ, তারই স্তরে স্তরে সোনার রঙের অজস্র ফুল যেন বসন্তের বীণায় বাহার রাগ-রাগিণীর ঝঙ্কার লাগিয়েছে, বাতাসে দিয়েছে সুগন্ধের মীড়।'

এক অপরূপ সাজে লতানে গাছের ফুলের রবীন্দ্রনাথ নামকরণ করেছিলেন— 'নীলমণিলতা'। বসন্তের শুরুতেই স্তবকে স্তবকে এই নীল ফুলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কবি-বন্ধু উইলিয়াম পিয়ারসন উত্তরায়ণের কোনার্ক বাড়ির আঙিনায় এই বিদেশি গাছের চারা রোপণ করেছিলেন।

নাচ আর গান বসন্ত উৎসবের প্রধান অঙ্গ। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠানের গান ও নাচ সহজ স্বাভাবিক মার্জিত রূপে শান্তিনিকেতন ও তার বাইরে, বিশেষ করে বাঙালি সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উৎসবে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী-কর্মীদের বর্ণাঢ্য সাজসজ্জা সম্পর্কে একথা দ্বিধাহীন কণ্ঠেই বলা চলে।

সেকালে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আরো নিবিড়ভাবে গড়ে তোলবার জন্য 'মাস্টারমশাই' শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু শালবীথি আর আম্রকুঞ্জের গাছের গায়ে নানান রঙের উত্তরীয় বেঁধে সাজিয়ে দেবার এক অপূর্ব শিল্পশৈলীর সূচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠানের মূল সুরটিকে এমনভাবে বেঁধেছিলেন, যাতে এর মাধুর্য কোনোরকম কলুষকে ডাকতে পারেনি। দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, অংশগ্রহণ করতে কোনোরকম বাধা থাকে না।

সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি— শান্তিনিকেতনে বসন্ত বন্দনার এক অন্যতম বিশেষ দিক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শান্তিনিকেতনের আশেপাশের গ্রামের সাধারণ মানুষ, এমনকী সাঁওতাল মানুষজনও বসন্ত উৎসবে অংশ নেন আন্তরিকভাবে।

পলাশ মানেই বসন্ত। আর বসন্ত মানেই শান্তিনিকেতন। কয়েক দিন আগে থেকেই বসন্ত ছুটে আসে শান্তিনিকেতনের পলাশ-শিমুল আর কৃষ্ণচূড়ার মাথায় মাথায়। ফাগুন এসে যায় নানান রঙের ডালি সাজিয়ে। বনে-বনে আর অপার্থিব সৌন্দর্যে নীরব খোয়াইয়ের বুকে ফাগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আশ্রম চঞ্চল হয়ে থাকে মৌমাছির গুঞ্জনে। কবির দেওয়া নাম 'অগ্নিশিখা'-র ডালে এখন আগুনের হলকা। গাছের ডালে নব কিশলয়ের আহ্বান। আশ্রম জুড়ে শাল-মহুয়ার গন্ধে ভরপুর। শালবীথির চত্বর ঢেকে থাকে শালের মঞ্জরিতে। পলাশ-অশোক-বাসন্তী-শিমুল-মহুয়া-শিরীষ-মাধবী-শালমঞ্জরি আর কৃষ্ণচূড়া ফুলের বর্ণে আর উজ্জ্বলতায় স্বাগত জানায় 'ঋতুরাজ'-কে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "উৎসবের শেষ বেলাকে তোমার অক্লান্ত মঞ্জরী ঐশ্বর্যে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীর কণ্ঠে। সেই ধ্বনি আজ আকাশকে পূর্ণ করল, বিপদের ম্লানতা দূর করে দিলে। অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমিই শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'।"

> ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল
> মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন
> সৌরভ ধনে তখন তুমি হে শাল
> বসন্তে করো ধন্য।

বসন্ত ঋতুর মধ্যেই একদিন আশ্রমে বসন্ত উৎসবের দিন আমাদের ডাক দিয়ে যায়।

কখন কীভাবে কেমন করে শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের সূচনা হয়েছিল সেই ইতিহাস পর্বের দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক। বসন্ত উৎসবের সূচনা বলতে গেলে— 'ঋতু উৎসব' হিসেবেই শুরু। সেটা ১৯০৭ সালের কথা। তদানীন্তন ছাত্রাবাস 'প্রাককুটির'-এর (বর্তমান শমীন্দ্র পাঠাগার) সামনে থেকেই এই উৎসব শুরু হয়েছিল। কবি পুত্র শমীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। কালে কালে এই ঋতু উৎসব বসন্ত উৎসবে রূপ নেয়। ধর্মের বেড়া ভেঙে, বৈষম্য, অসাম্যের বন্ধন ছিন্ন করে কবি সবার রঙে রং মিশিয়ে দিয়েছিলেন। বসন্ত উৎসব হচ্ছে প্রকৃতির আরাধনা।

সম্ভবত ১৯২৫ সালের ছাব্বিশে ফাল্গুন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বসন্ত উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। ভরা বসন্তে সেদিন ছিল তুমুল বৃষ্টি আর সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। যার ফলে সেদিন আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠান হতে পারেনি।

সেই প্রথম বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এখন যেখানে পাঠভবনের আপিস তার দোতলায় তদানীন্তন কলাভবনের ঘরে। এই উৎসবে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> রুদ্র বেশে কেমন খেলা
> কালো মেঘের ভ্রূকুটি
> সন্ধ্যাকাশের বক্ষ যে ঐ
> বজ্রবানে যায় টুটি।

সেকালের বসন্ত উৎসবের প্রস্তুতির বর্ণনা দেখতে পাই প্রথমনাথ বিশী-র লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বইটিতে। তিনি লিখেছেন— 'সেবারে বসন্তোৎসব খুব ধুম করিয়া হইবে স্থির হইল। রবীন্দ্রনাথ নূতন গানের পালা লিখিয়া গানের দলকে শিখাইয়া তুলিলেন। আম্রকুঞ্জের সভাস্থল আলপনা ও আবিরে সজ্জিত হইল; আমের ডালে ডালে বাতির ব্যবস্থা হইল, সকলে পীতবর্ণের ধুতি ও শাড়ি পরিয়া প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল— পূব আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিলেই সভারম্ভ হইবে।...'

ছবি: সুশোভন অধিকারী

১৯৩৫ সালের ২০ মার্চ (১৩৪১-এর ৫ চৈত্র) সকালে আম্রকুঞ্জে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়েছিল। 'ফাল্গুনী' নাটকের কিছু অংশ রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেছিলেন। এর আগে তিনি উৎসবের মূল কথাটি বলেন। সেবারের বসন্ত বন্দনায় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন আচার্য ও দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রবীন্দ্র স্নেহধন্যা ইন্দিরা গান্ধী, সেদিনের আশ্রমের ছাত্রী ইন্দিরা নেহরু নাচের দলে যোগ দিয়েছিলেন।

'কে দেবে গো চাঁদ তোমায় দোলা' এবং 'তোমার বাস কোথা যে পথিক ওগো' এই দুটি গানের সঙ্গে ইন্দিরা নেহরু সমবেত নাচের সঙ্গে নেচেছিলেন। সন্ধ্যার পর আম্রকুঞ্জে গান-নাচ-পাঠ-আবৃত্তির আয়োজন হয়েছিল। কবি 'বসন্ত' কবিতা আবৃত্তি করেন। 'আমার বনে বনে ধরল মুকুল' এবং 'ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী'— কবির সদ্যরচিত এই দুটি গান তিনি নিজেই গেয়েছিলেন।

পরের বছর ১৯৩৬ সালের ৮ মার্চ সারা আশ্রম জুড়ে বসন্ত উৎসবের আসন পাতা হয়ে আছে। এই উৎসবের দিনই সকালে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্বভারতীর প্রাক্তন আচার্য জওহরলাল নেহরু-র পত্নী কমলা নেহরু-র মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছোয়। এইদিন মন্দিরের উপাসনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন— '... এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নবজীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব ...নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের ঋতুরাজ জওহরলাল। আর আছেন বসন্ত লক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য সত্তায় সম্মিলিত।'

আজ থেকে ৭৯ বছর আগে ১৯৪০ সালের সাতাশে মার্চ রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতন বসন্ত উৎসবের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন। সেবারে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিংহসদনে। এই অনুষ্ঠানে 'অস্পষ্ট' কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে বসন্ত-কে কবি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এর পরের বছর ১৯৪১ সালে অসুস্থতার ফলে কবি উৎসবে উপস্থিত হতে পারেননি। সে-বছর সন্ধ্যায় 'নটীর পূজা' অভিনীত হয়। অসুস্থ থাকবার দরুন কবি যেতে পারবেন না

বলেই তাঁর সামনে একদিন 'নটীর পূজা' মঞ্চস্থ হল। এই বসন্ত উৎসবের দিনে কবি লিখেছিলেন—

আর বার ফিরে এল উৎসবের দিন
বসন্তের অজস্র সম্মান
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসর বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।

বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী ও কবির স্নেহধন্যা কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন যে, একবার শান্তিনিকেতন ছাড়িয়ে গোয়ালপাড়া গ্রামে বসন্ত উৎসবের আয়োজন হয়েছিল। বসন্ত-কে আহ্বান জানিয়ে নৃত্য ও গানের অনুষ্ঠানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতি বছরের মতো, শান্তিনিকেতনে আবার পলাশ বনের নিমন্ত্রণ। উৎসবের আগের রাতে গৌরপ্রাঙ্গণ থেকে 'ও আমার চাঁদের আলো' গানের সঙ্গে শালবীথির পথ ধরে এগিয়ে চলে বৈতালিক দল। পরের দিন ভোরে বসন্তের আবাহনী বৈতালিকে সূচনা হয় বসন্ত বন্দনার— 'আজ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গান দিয়ে। এখন অবশ্য আম্রকুঞ্জ নয়, গৌরপ্রাঙ্গণের স্টেজে অনুষ্ঠান হয়ে আসছিল। কিন্তু গতবছর থেকে আয়োজিত আশ্রমের খেলার মাঠে। এখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে পূর্বপল্লির মাঠে।

শান্তিনিকেতনে বসন্তের বরণ— যার শুরু 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল, / স্থলে জলে বনতলে লাগল যে দোল' আর অনুষ্ঠানের শেষ 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও যাও গো এবার যাবার আগে'— এই সমবেত গান দিয়ে।

নাচের দলের গায়ে বাসন্তী রঙের জামা আর কমলা রঙের উত্তরীয়। সবার হাতে তালপাতার ডোঙ্গায় ভরা পলাশ আর শাল ফুল। প্রত্যেকের কপালজুড়ে রক্তিম আবিরের প্রলেপ। 'ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল'— সমবেত কণ্ঠে গানের সঙ্গে 'শান্তিনিকেতন' বাড়ি থেকে বিশ্বভারতীর ছাত্র-ছাত্রী— মাস্টারমশাই-কর্মী-আশ্রমিকদের বর্ণবহুল এবং নৃত্য-গানে উচ্ছ্বসিত এক বিশাল শোভাযাত্রায় নানান উপাচার নিয়ে বসন্তের আবাহন।

সকালে এক স্নিগ্ধ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বসন্তের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য দেওয়া হয় বৈদিক মন্ত্রে গানে পাঠে নাচে কবিতায়। 'যা ছিল কালো ধলো'— এই গান শেষ হতে না হতেই শুরু হয়ে যায় আবির খেলা। নীল দিগন্তে আঁচল পেতে বর্ণময় বসুন্ধরা। শান্তিনিকেতনের রং খেলা এখনও শুধুমাত্র আবিরেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তাই বলে আনন্দের কোনো ঘাটতি থাকে না।

সকালে বসন্ত আবাহনের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর, সীমাহীন আকাশের নীচে বাসন্তী রঙের বেশে সজ্জিত ছেলে-মেয়েরা ছোটো ছোটো দল করে আশ্রমের নানান জায়গায় গান ও নাচ করে। সবার মনেই একটা অন্যরকম ছাপ রেখে যায়।

একেবারে শেষবিকেলে আশ্রম ছাড়িয়ে পূর্বপল্লির মাথার ওপর দিয়ে 'পূর্ণ চাঁদের মায়া'। চাঁদের হাসির বনে তখন আশ্রমের গোটা চত্বরজুড়ে। এই পূর্ণিমা সন্ধ্যায় বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যের কোনো একটি অভিনীত হয়। আম্রকুঞ্জে শোনা যায় কোকিলের ডাক। দূর থেকে সমবেত গলায় গানের সুর ভেসে আসে—

ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান
আমার আপনহারা প্রাণ আমার
বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ।

নান্দনিক বিভাসে কবি আমাদের অন্তরে অন্তরে ফাল্গুন-কে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বসন্তের যে গান ফাগুনের নবীন আনন্দে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ওঠে বেজে। এই শান্তিনিকেতনী বসন্তের আনন্দের নবীনতাকে যে-কেউ হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন, আবিষ্কার করতে পারেন নতুনভাবে। এ-কারণেই ঋতুরাজ বসন্ত বিচিত্রের দূত, নবীনের সঞ্জীবনী, প্রবীণের স্মৃতিমেদুর।

ফাল্গুনের আনন্দগান তো হৃদয়ের সাথে একাত্ম হবার গান। ফাগুন এজন্যেই চিরনবীন। ঋতুর সেরা কোনটি। মতভেদ থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু বসন্তের পক্ষেই রায় দেবেন অধিকাংশ মানুষজন। ঋতুকে বরণ ও সম্মাননার বিশিষ্টতার জন্যই শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবের সমারোহ। আর এই বসন্ত উৎসব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে, সমগ্র বাংলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তাও বলা চলে নির্দ্বিধায়।

রবীন্দ্র স্নেহধন্যা, বিশিষ্ট লেখিকা ও আশ্রমকন্যা অমিতা সেন-এর কাছে সেকালের বসন্ত উৎসবের কথা শোনবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তখন অমিতাদি-র বয়স নব্বই। শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়িতে বসে অমিতা সেন বলেছিলেন: আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথ দোলের সময় বেশ আনন্দের সঙ্গেই শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব করতেন। কিন্তু রং খেলা নিয়ে কখনোই কোনোরকম মাতামাতি গুরুদেব পছন্দ করতেন না। আমাদের সময়, দিনদা-র (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নেতৃত্বে খুব ভোরে 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' গান গাইতে গাইতে আশ্রমের প্রতিটি বাড়ির দুয়ারে আমরা বৈতালিক দল পলাশ আর আবির রেখে আসতাম। তখনকার সময়ে এটাই ছিল বসন্ত উৎসবে আশ্রমের সবাইকে যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর রীতি। সকালে আম্রকুঞ্জে বসন্ত উৎসব হত। অনুষ্ঠান শেষে আমরা গৌরীদি-র (প্রথিতযশা চিত্রশিল্পী গৌরী ভঞ্জ) সঙ্গে সবাই 'উদয়ন' বাড়িতে গিয়ে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পায়ে আবির দিয়ে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে আসতাম।

এই সমস্তটাই ভাবতে অনেক বেশি ভালো লাগে। এখন এসব অতীতের স্মৃতি।

সেকালে, রবীন্দ্রনাথের সময়ে বসন্ত উৎসব ছিল একান্তভাবেই শান্তিনিকেতন-আশ্রমের। কবির প্রয়াণের বেশকিছু বছর পর থেকেই এই উৎসব হল জন-গণেশের। 'রাজা' নাটকে বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে জনগণের ছিল অবারিত দ্বার। রাজা-প্রজা সকলেই একই আবিরে রাঙা হয়ে ওঠেন।

অনুষ্ঠান শেষে আশ্রমের নানান জায়গায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত গান ও নাচ সকলের মনে এক অবিস্মরণীয় অনুভব রচনা করে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কোনো এক সময় আবির খেলাও থেমে যায়। ভরদুপুরের নির্জনতার মধ্যে বসন্তের দক্ষিণা বাতাসে নানান রঙের আবিরচূর্ণ উড়ে বেড়ায়। এসব স্মৃতি এখন ধূসর হয়ে গেছে।

কিন্তু চিরকাল তো সব একইভাবে চলতে পারে না। দিনকাল বদলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত উৎসবের ঐতিহ্য, চরিত্র ও চেহারাও বদলে যাচ্ছে। মনে পড়ে, ১৯৮০ সালের বসন্ত উৎসবে বেশকিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল। সে বছরে বিশেষ করে ছাত্রী ও মহিলাদের ওপর অশোভন আচরণ চরমে পৌঁছেছিল। এইসব নানান কারণে বিশ্বভারতী প্রশাসন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, বসন্ত উৎসব আর হবে না। নানান মহলের চাপে আবার শুরু হল। বিরাশি সাল থেকে আবার সকালে বসন্ত বন্দনা ফিরে এল।

এর দু-বছর বাদে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. নিমাইসাধন বসু কর্মী-শিক্ষক-ছাত্র-ছাত্রী-আশ্রমিক এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে বিশদ আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যতটা সম্ভব হারানো মাধুর্য ও ঐতিহ্য-কে ফিরিয়ে আনবার আন্তরিক চেষ্টা করেছিলেন।

তবে সামাজিক পরিস্থিতি ও নিরাপত্তার কথা ভেবেই চিরকালের উৎসবক্ষেত্র 'আম্রকুঞ্জ'-কে বাদ দেওয়া হয়েছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই উৎসবের ঐতিহ্য আর আনন্দ অনেকটাই কমে যায়। সেই থেকে সকালে বসন্ত বন্দনা অনুষ্ঠিত হতে লাগল গৌরপ্রাঙ্গণে পূর্বমুখী। শান-বাঁধানো স্টেজে জালের আবরণে। তারপর আবার স্থান বদল। গত পাঁচ বছর ধরে শান্তিনিকেতনের আশ্রম মাঠে নির্মীয়মাণ স্টেজে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বসন্ত উৎসবের ইতিহাসে ২০০৯ সালের বছরটি ছিল, একটি 'কালো দিন'। সেবার 'বসন্ত কাণ্ডে'-র জেরে সব উৎসব-অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে গিয়েছিল। এ-বছর, ২০১৩ সালে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হল আশ্রম চৌহদ্দির বাইরে, পূর্বপল্লির পৌষমেলার মাঠে। খুব স্বাভাবিকভাবেই এবারের বসন্ত উৎসব নিয়ে নানা বিতর্ক উঠেছে।

পলাশ ফুল হচ্ছে বসন্ত উৎসবের অন্যতম উপাচার। বিগত কয়েক বছর ধরে শান্তিনিকেতন ও তার আশেপাশে গাছ শূন্য করে পলাশ সংগ্রহের উগ্রতা, উদ্দামতা দারুণভাবে বেড়ে গিয়েছিল। যা কোনোভাবেই দৃষ্টিনন্দন ছিল না। কিন্তু এবারের বসন্ত উৎসবে পলাশ বাঁচাতে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসন যে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে।

তবে সবমিলিয়ে, শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপনে বেশকিছু সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে অনিবার্যভাবে। ভিড় বেড়েছে অস্বাভাবিক। আর সে ভিড়ের চরিত্র অনেক সময়েই রবীন্দ্র শালীনতাকে মান্য করতে গররাজি। নিরাপত্তা ও শোভনতার প্রশাসনী তৎপরতার পাশাপাশি প্রয়োজন 'আশ্রম-মরমি' মানুষের সতর্কতা।

রবীন্দ্রনাথ একদিন যে বসন্ত বন্দনার সূচনা করেছিলেন, বহু যুগের ওপার হতে তা কালের স্রোতে আবর্তিত হয়েও, বসন্ত উৎসবের সেই অপরূপ মাধুর্যের ছোঁয়া আজও অনেকটাই জেগে আছে।

ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এই উৎসবের মূল সুরটি হল ফাগুনের নবীন আনন্দে সঞ্জীবিত হওয়া। প্রকৃতি ও মানুষের উচ্ছল অথচ শুচিস্নিগ্ধ এমন সম্মিলন আর নেই। মনে হয় এসব কারণেই, প্রতি বছর দূরের ও কাছের, দেশ-বিদেশের নানান মানুষজন ও রবীন্দ্রানুরাগীরা আসেন শান্তিনিকেতনে, বসন্ত উৎসবের রঙিন সমারোহ, তার শুদ্ধ মাঙ্গলিক এবং নান্দনিকতার বিস্মিত সমারোহের স্পর্শ নিতে।

আর এভাবেই ছড়িয়ে গেছে দিকে দিগন্তরে রবীন্দ্র স্বপ্নের নানা দিক— বসন্ত স্বপ্নের শিল্পিত অভিব্যক্তি। শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসবের আবেদনের শেষ নেই।

পাড়া-জীবনের লগ্নতা, স্মৃতিনির্মিত ইতিহাস

শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য

দক্ষিণ আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ না থাকলেও এই উপন্যাস পড়ে তা নির্মাণ করে নেওয়া যেত— বলেছিলেন ফ্রেড ডি'আগিয়্যার, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ারস অফ সলিটিউড সম্বন্ধে। যদি কালীঘাট, কেওড়াতলা শ্মশান, রাসবিহারীর মোড় থেকে আদিগঙ্গা ধরে টালিগঞ্জ অবধি অঞ্চলটা তার টানা-পোড়েন, প্রেম, সান্ধ্য কুয়াশা, রাজনীতির জটিলতা, মন্দিরের কার্নিভ্যালপ্রতিম তুঙ্গরব নিয়ে না থাকত, যদি সত্যিই মহাতীর্থ কালীঘাটের রথের মেলা বন্ধ হয়ে গিয়ে সেই স্থানে মারুতি সুজুকির গাড়িদের বিক্রয়স্থল না গড়ে উঠত, এবং যদি কলকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত ক্লাস সিক্স এবিসিডি কিশোর-কিশোরীদের ষাট সত্তর আশির দশক শেষ কয়েক বছরেই টাইমমেশিনে চড়িয়ে যেন পঞ্চাশ বছরের পার না-ই করিয়ে দিত, যার মধ্যে হিরোরা বুড়ো হয়ে যান, বসতবাড়ি ভেঙে উঠে যায় ফ্ল্যাট, উজ্জ্বলা সিনেমাহল বন্ধ হয়ে গিয়ে চকচকে শপিং মল খুলে যায় এবং শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লিকে কেন্দ্র করে রমরম করে গজিয়ে ওঠে মৃতের জামা কাপড় বিছানা বিক্রির অবৈধ ব্যাবসা, তাহলেও সেই অঞ্চলটাকে নির্মাণ করে নেওয়া যেত, যদি সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের 'বুনো স্ট্রবেরি' এবং কল্লোলের 'তক্কোগুলি, চরিতাবলী ও আখ্যানসমূহ' এই দুটো বই পড়ে নেওয়া যেত। এটা সম্ভবত কালচেতনা নামক ধারণাটির নিরিখে এক আশ্চর্য সমাপতন যে স্থানীয় সংস্কৃতি, জনজীবন এবং ইতিহাস নির্মাণের উপর দুটো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যধর্মী কাজের প্রকাশ ঘটল পিঠোপিঠি সময়ে, এবং কী আশ্চর্য, দুটোরই বিষয় কালীঘাট।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তর্কযোগ্যভাবেই বাংলার জীবিত গদ্যকারদের মধ্যে একদম সামনের সারিতে থাকবার অধিকারী। ঋত্বিক ঘটকের তন্নিষ্ঠ অনুসারী এবং এই বাংলার সিনেমাকাব্যকে পাঠপ্রয়াসের জন্মদাতা, শুধুমাত্র এই পরিচয়টুকুতেই তাঁকে আর আবদ্ধ রাখা যাবে না। সঞ্জয় তাঁর সারজল সংগ্রহ করেন বৈষ্ণব কাব্য থেকে, লালন, সৈয়দ আলাওল, মনসামঙ্গল থেকে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে আহরিত তাঁর দীক্ষা অনায়াস সহজতায় ঝরে পড়ে মার্কেজের পঠনে, দস্তয়েভস্কির সংকট ও নিরাময়ের ক্ষুরধার পর্যবেক্ষণে। পাঠপ্রক্রিয়া কীভাবে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য হয়ে ওঠে তাকে বুঝতে গেলে সঞ্জয়কে পড়তেই হবে। আর সেই পড়বার সূত্রেই তাঁর সাম্প্রতিক বই, বুনো স্ট্রবেরি হয়ে উঠেছে বাংলার আঞ্চলিক সংস্কৃতিপাঠের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। শুধুই ইতিহাস নয়। এই বইকে পড়া যায় নিছক সাহিত্য হিসেবেও, যদিও সে সাহিত্যের আস্তিনে লুকোনো থাকে কালীঘাটের একের পর এক অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়। জন্ম থেকে ওই অঞ্চলের বড়ো হয়ে ওঠার সূত্রে সঞ্জয় জানেন সে পাড়ার প্রেমে মিশে থাকে অসম্ভব বেদনার সঙ্গে অমোঘ আমোদ। কালীঘাটের কুকুর, সেবায়েত বংশ, তার পুজোর উপাচার অথবা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নিষ্ঠ কমরেডের আখ্যান, সবের উপরেই তুলি চালিয়ে সঞ্জয় চাপিয়ে দেন চ্যাপলিনেস্ক চপলতার একমেটে রং, যার নীচে অন্তঃশীলার মতো বহমান হয়ে থাকে একটি হারানো সময়কে খুঁড়ে চলবার যন্ত্রণা।

অপরদিকে, কল্লোলের কালীঘাট এক খণ্ড সময়ের আখ্যান, যেখানে জেলফেরত নকশাল কিছু তরুণের আড্ডার জায়গা, চায়ের দোকান, তার মাস্তান জগৎ, সত্তরের সন্ত্রাস, কিলিং আর হানাহানির ক্ষত সারিয়ে ধীরে ধীরে পুনঃনির্মিত হতে থাকা বামপন্থী ভদ্রলোকীয় সংস্কৃতি এবং সেই সূত্রেই বাম দলগুলির দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের তিক্তমধুর কাহিনি মেঘের মতো ছায়া ফেলে থাকে আদিগঙ্গার জলে। কল্লোল নিজে থাকতেন টালিগঞ্জে, কিন্তু কালীঘাটে তপনের চায়ের দোকানে আড্ডার সুবাদেই সেখানে নকশালপন্থী তরুণদের নিয়ে গড়ে তোলা সংগঠন পিপিএফ, সেইসূত্রে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, নির্বাচনের সময়ে বামফ্রন্টকে সমর্থনমূলক কর্মসূচি এবং কালের নিয়মে একসময়ে সেই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধেই প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়ে পড়া, প্রায় দশ বছরের এই ঘটনাবলি কালীঘাটকে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের দেখার একপ্রকার বিপ্রতীপে দাঁড় করিয়ে দেয়। যদি রাজনৈতিকভাবে দেখি, তাহলে সঞ্জয়ের দেখাটি, মৃদুভাবে হলেও, এক

সিপিআই(এম) কর্মীর চোখ দিয়ে দেখা, আর কল্লোলের দেখাটি হল এক নকশালপন্থী কর্মীর চোখ দিয়ে দেখা। আবার দৃষ্টির অবস্থানকেই যদি প্যারামিটার ধরি, তাহলে সঞ্জয় যেন ভিতর থেকে অঞ্চলটিকে দেখছেন। আর কল্লোল দেখছেন বহিরাগতের চোখ দিয়ে। তাই সঞ্জয় যখন মন্তব্য করছেন 'এখানে নতুন বউঠানকে চিঠি লিখলে লোকে দেবেন ঠাকুরের ছেলেকেও বলবে পেঁচোয় পেয়েছে'। কল্লোলের কালীঘাটে তখন চেয়ারম্যান মাওয়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে রাসবিহারী জগতসুধার গুরুদ্বারের উলটো দিকে ক্যারাম বোর্ড ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে দশ-বারো জন নতমস্তক তরুণের গলায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে উঠে আসছে ইন্টারন্যাশনাল গান। দেখার এই বিপ্রতীপতা, একদিকে সঞ্জয়ের সাংস্কৃতিক ভাষ্য এবং অপরদিকে কল্লোলের, ভাঙাচোরাভাবে হলেও, পুনর্নির্মাণের রাজনৈতিক ভাষ্য, ঠিক এই-দুটো আলাদা দিককে মিলিয়ে না পড়লে কালীঘাট-দর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে। কিন্তু এই বইদুটির গুরুত্ব এখানেই শেষ হয়ে যায় না। এর পরেও, স্থানিক ইতিহাস এবং খণ্ড সময়ের নির্মাণে স্মৃতির ভূমিকা নিয়ে যদি বাংলা সাহিত্যের কাছে ভবিষ্যতের গবেষককে ফিরে আসতেই হয়, তাহলেও তাঁকে এই দুটি রচনার কাছে হাত পাততে হবে। কেন এই কথা বলছি? একটু অতীতচারণ করা যাক।

ঐতিহাসিক মার্ক ব্লখ তাঁর ইতিহাস রচনাপদ্ধতিতে একটা অদ্ভুত জিনিস শুরু করেছিলেন। তিনি মহাফেজখানার কিম্বা গির্জার নথি, পূর্বলিখিত ইতিহাস ইত্যাদির বাইরেও নানা সূত্র খোঁজা আরম্ভ করেছিলেন। দক্ষিণ এবং উত্তর ফ্রান্সের সংস্কৃতির জনজীবনের পার্থক্য খুঁজে পেয়েছিলেন তাদের চাষের পদ্ধতির ভিন্নতায়। ঠিক তেমনভাবেই একটি বিক্রি হয়ে যাওয়া বাড়ির কাহিনি অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়া একটা ক্লাবের গল্পও একটা সময়ের সাক্ষী হতেই পারে। মীনা মেনন এবং নীরা আদকরকার মুম্বই শহরের বন্ধ হওয়া কটন মিল বা অন্যান্য উৎপাদন শিল্পগুলিকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের স্মৃতি নিয়ে, যা এখন সবটাই শপিং মল বা ফ্ল্যাটবাড়িতে পরিণত, অসাধারণ কাজ করেছেন নতুন শতাব্দীর গোড়ার দিকে। আশির দশকের শেষ দিক থেকেই দুর্গাপুর আসানসোল অঞ্চলের জনজীবন, বিশেষত উৎপাদন শিল্পের দুরবস্থা শুরু হওয়ার পরের জীবন নিয়ে ঠিক ইতিহাস না হলেও গল্প-উপন্যাস লিখছেন অসীম চট্টরাজ যেখানে নানা বিস্তারে এসেছে শিল্পাঞ্চল প্রসঙ্গ। আবার বীণা দাস দেশভাগের সময়কার মহিলাদের স্মৃতিকথা টেনে তুলে নিয়ে এসে সেই ইতিহাসের একটা অপর ভাষ্য তৈরি করেছেন। তো, এসবের ফলে যেটা ঘটছে, এবং গত কয়েক দশকের নিম্নবর্গের ইতিহাস কথ্যচেতনা এবং স্মৃতিকে আলেখ্য করে যেভাবে দেখা নামক প্রক্রিয়াটির ভরকেন্দ্রে একটা বদল আনছে, সেখানে ইতিহাস রচনা মানেই যে দলিল এবং মহাফেজখানা বা সরকারি নথির শক্ত গাঁথুনির উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ইমারত, এই ভাবনাটা আস্তে আস্তে পালটাচ্ছে। একটি ছোটো অঞ্চলের স্মৃতিকথা, যেটা ওপর থেকে কেজো দলিলের হাত ধরে নামছে না, বরং নীচ থেকে উঠে আসছে, সেটাও এক ধরনের ইতিহাসচেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করছে। যেমন দুর্গাপুরের সোমনাথ রায়, যিনি কলকাতা এবং কৃষ্ণনগরের মাটির ভাঁড়ের গঠন ও নকশা কেন আলাদা, সেই আপাত তুচ্ছ প্রশ্নের উত্তর ভাঁড়ের কারিগরদের কাছ থেকে খুঁজতে গিয়ে কালক্রমে স্থাপত্যশিল্পের এক অন্য ইতিহাসই নির্মাণ করে ফেলছেন বলা যায়, এবং সেইসূত্রে বানিয়ে ফেলছেন প্রায় পাঁচ হাজার লিটল ম্যাগাজিন ও ঐতিহাসিক বইয়ের একটি অমূল্য লাইব্রেরি। এই ধরনের নানারকম কাজ যেখানে হচ্ছে, ঠিক তখনই সঞ্জয় এবং কল্লোলের বইদুটি প্রকাশ পাচ্ছে, যারা পাথুরে প্রমাণের বদলে স্মৃতিনির্ভর কাহিনির আঙ্গিকে একটি নিকট সময়কে পুনর্নির্মাণ করে ফেলছে। ব্যাপারটাকে ঠিক সমাপতন বলা যায় না, বিশেষত বুনো স্ট্রবেরি পড়লে আরোই বেশি লাগে না, কারণ এর পেছনে একটা রাজনীতি আছে। মিলান কুন্দেরা যেমন বলেছিলেন যে ক্ষমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আসলে বিস্মৃতির বিরুদ্ধে মনে রাখার সংগ্রাম, হয়তো অনেকটা সেই সূত্র মেনেই যে সময়টুকু হারিয়ে যাচ্ছে তাকে বার বার মনে করিয়ে দিতে চাইছেন লেখকেরা।

সঞ্জয় কালীঘাটে অতিবাহিত একটা বড়ো সময়, পঞ্চাশের দশক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত, স্মৃতিচারণ করেছেন, এবং কল্লোল করেছেন তাঁর যৌবনের একটা অংশকে প্রেক্ষাপটে রেখে। এবার, এই যে কলকাতার বদলে যাওয়া মুখ, বিশেষত উদারনীতির জমানাতে আরো বেশি করে, নতুন ধরনের নগর পরিকল্পনা, নতুনভাবে এই শহরকে শুধু উচ্চাশার ভাস্কর্য করে তোলার যে প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, সেটাই হয়তো আমাদের ভাষার একেবারে হালের সংস্কৃতিতে নতুন এক ধরনের স্মৃতিকাতরতার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ট্রেন্ড নয়। শিল্পবিপ্লবের সময়ে গড়ে ওঠা অথচ এখন বিধ্বস্ত ইউরোপীয় বা ব্রিটিশ শহরও বহু বহু নতুন রচনার বিষয় হয়েছে ওখানকার সাহিত্যে। ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকের সময়ে যা ভাঙা পড়ছিল বা যা ঢাকা পড়ছিল সে বিষয়ে অসামান্য প্রবন্ধ লিখেছিলেন ইয়ান সিনক্লেয়ার। লন্ডনে পরিত্যক্ত কারখানার স্থাপত্য কাজে লাগিয়ে আকাশছোঁয়া আরামের ফ্ল্যাট বানানো নিয়ে তির্যক লেখা লিখেছেন উইল সেল্ফ। এই নিজেকে কিছুটা হারিয়ে ফেলা, এবং হারানো অঞ্চলকে খুঁজে ফেরা, এই ব্যাপারটা শহুরে সাহিত্যে বার বার ঘটেছে, এবং এর গুরুত্ব এখানেই যে নাগরিক ইতিহাসকে সেটা একটা বিকল্প

বাস্তবতার নিরিখে প্রশ্ন করে। এটা বোঝা দরকার যে সারা পৃথিবী জুড়েই অনেক শহরেই সংকটের কারণ বিচিত্র বা নানা সময়ে সংঘটিত হলেও, তার সাদৃশ্য এক বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিচ্ছে, যার সঙ্গে শিল্প বিপ্লবের শুরুর দিককার রোমান্টিক প্রতিক্রিয়ার বা গ্রামকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উদ্গাতাদের একটু পার্থক্য আছে। এই প্রতিক্রিয়া আধুনিকতা বা নাগরিকতাবিরোধী নয়, কিন্তু নগরের উন্নয়নের ধারণাটিকে সংঘর্ষ ও সহাবস্থানের মাধ্যমে যাচাই করতে করতে এগিয়ে চলে। সেটা নস্টালজিয়ার মাধ্যমেই ঘটে, কিন্তু ভেতরের রাজনীতিটি নস্টালজিয়ার ডিহিস্টরাইজেশন ঘটায় না।

এই দিক থেকে বইদুটিকে পাঠ করলে তারা এক অন্য অর্থের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। সঞ্জয় বলেন 'আমরাও বাস্তবের কালীঘাটে চু-কিতকিত খেলে গেছি দিবাস্বপ্নের টুকরো দাগ রেখেই'। অর্থাৎ বাস্তবতাকে মান্যতা দিয়েও তাকে বুড়িছোঁয়া করেই এক স্বপ্নজগতকে যেন রচনা করেন সঞ্জয়। তিনি নিজেই ভূমিকাতে লিখেছেন যে এই বই ইতিহাস নয়। কিন্তু পাঠক আমরা, সেকথা মানতে যাবই-বা কেন। 'ডিহি কালীঘাটের পূর্বরাগ ও বিবাহ সংবাদ' যতটা সাহিত্য, ঠিক ততটাই কি জনপ্রিয় সংস্কৃতির আধারটুকুর মধ্যে সমাজপরিক্রমা ছিল না? ভিয়েতনামের অনুপ্রেরণায় ঝুলনে রাধাকৃষ্ণের মূর্তির সামনে যিনি ভিয়েতনাম সাজিয়ে দেবার প্রয়াস পড়তে গিয়ে অব্যর্থ ধরা পড়ে যাচ্ছিল সমাজ ও সময়। সত্তরের দশকে ক্ষীরোদ ঘোষ বাজারে হকারেরা গোপাল ভাঁড়, বায়ুরোগ ও তাহার প্রতিকার এবং বম্বে ফিল্মের গানের সঙ্গে যখন রেড বুকও বেচতে শুরু করল, স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা আধাখ্যাঁচড়া তালগোল পাকানো কালসন্ধিতে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার জড়াজড়ি বেড়ে ওঠা। এই এবড়োখেবড়ো, বহুরঙা অতীত এভাবে ফিরে দেখা ইতিহাস না হলে, ইতিহাস কী!

কিন্তু তার পরেও সঞ্জয় যেন পাঠকের সঙ্গে একপ্রকার খেলায় মাতেন। যে ঐশ্বরিক ভাষা তাঁর বাম হস্তের পোষমানা, সেই ভাষা খেলিয়ে সঞ্জয় স্বপ্ন এবং বাস্তবের মধ্যে ফারাক ঘুচিয়ে দিতে চান। দুপুরবেলা রামাবতারের দোকানে রাখা কাঠের গুঁড়োতে ঢাকা বরফের চাঁই দেখে দাঁড়িয়ে পড়া রক্তচক্ষু মোষের আখ্যান, সেই রেফ্রিজারেটরবিহীন যুগে, আর তার পরেই অব্যর্থ রেফারেন্সে এগিয়ে আসা কর্নেল অরেলিয়ানো বুয়েন্দিয়ার প্রথম বরফ দেখবার স্মৃতি, এই দুই-কে এক সুতোয় গেঁথে দিয়ে সঞ্জয় সম্ভবত দেখাতে চান যে স্বপ্ন এবং সত্যের মধ্যে যে সীমারেখা টানা হয়েছে সেটাকে চাইলেই টপকে যাওয়া যায়। সেই সূত্র ধরেই এই অধ্যায়টির, যার নাম 'কালীঘাটের পটকথা', তার শেষ কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করবার লোভ সামলানো গেল না—

'পথ ঠাহর করতে না পেরে একটা লক্ষ্মীপ্যাঁচা দাশবাবুদের ভাঙা ট্যাংকের ওপর ডানা মুড়ে বসল। চিলেকোঠায় সে-বাড়ির মেজো ছেলে ভোলা বাতি জ্বেলেই কেশব নাগের বীজগণিতে মাথা রেখেছে— ঘুমে ন্যাতা— তার স্বপ্নের জীবনে কোনও লগটেবিল নেই'। ভাঙা ট্যাংকের ওপর ডানা মুড়ে বসা সুখ-সমৃদ্ধির প্রতীক পাখিটির চিত্রে যে আপাত-বিরুদ্ধতা এবং অন্তর্গত কৌতুক, তার সংগত করে ভোলার স্বপ্নের মসৃণ উড়ান। উল্লেখযোগ্য 'ন্যাতা' শব্দটির ব্যবহার, সবথেকে প্রচলিত উপমা 'ঘুমে কাদা', তাকে একপাশে সরিয়ে রেখেই, যা টিপিকাল প্রাকৃত কালীঘাটকে ঝলসে দেয়। এইভাবে শব্দের পর শব্দ জুড়ে সঞ্জয় সযত্নে লুকিয়ে রাখেন তাঁর কালীঘাটকে। একে একটি স্বপ্নপ্রস্তাবনা হিসেবেও অভিহিত করা যেতে পারত, কিন্তু কল্পনার পরত ছাড়িয়ে ভেতরে ঢুকলে চোখে পড়বে নিখাদ সমাজবাস্তবতার আখ্যান, যাকে ইতিহাস বললে লেখক সম্ভবত আপত্তি করবেন না।

অবশ্য কল্লোলের বইটির ক্ষেত্রে সেরকম কোনো দ্বিধার জায়গা থাকে না। শুরু থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে স্মৃতিকথার মাধ্যমে একটি বিশেষ স্থানের বিশেষ সময়ের ইতিহাস। সেখানে আবার মাঝে মাঝে কিছুটা ইতিহাসের আধিক্যও ঘটেছে, যা লেখার গতিকে ব্যাহত করে। যেমন, নকশাল আন্দোলনের মধ্যেকার নানা দলের বিবরণ খুব প্রক্ষিপ্তভাবেই ঢুকে পড়েছে গল্প বলার মধ্যে। দরকার ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়া কেন সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ তা বলতে গিয়ে তিন পাতার বেশি ব্যয় করেছেন লেখক, যার মধ্যে এক পাতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রেফারেন্স। সেটাও-বা কেন, আর দুম করে কেনই-বা কালীঘাটের গল্প পড়তে গিয়ে সোভিয়েত নিয়ে আমরা আগ্রহী হব, বোঝা কঠিন। বইটির আরো কিছুটা নির্দয় সম্পাদনার দরকার ছিল। ভাষাতেও মাঝে মাঝে জগাখিচুড়ি বিপর্যয় ঘটে গিয়ে 'তারে বলতে পারিনি' জাতীয় বাক্য ঢুকে গেছে। কিন্তু এসব দুর্বলতা বাদ দিলে, কল্লোল নিষ্ঠাভরে যা করেছেন তা হল রাজনীতির আতশকাচ দিয়ে ওই অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাসের নির্মাণ। এবার, বাংলা বা ভারতের বাম রাজনীতির স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে এটুকু বলতে পারি, বাম আদর্শ ও কর্মসূচি বা সংগঠন পরিচালনা সম্পর্কে যাঁরা মনে করেন তিরিশ বা চল্লিশ বা পঞ্চাশের দশকে যে বিশুদ্ধ আদর্শ ছিল, সাম্রাজ্যবাদকে তাড়িয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠার লড়াইতে অংশগ্রহণের যে ইচ্ছা ছিল, ষাটের দশকে তাই পরিণত হয় রাষ্ট্রের সঙ্গে সুবিধাগ্রহণের সম্পৃক্তিতে এবং তার প্রতিক্রিয়াতেই চিন-সোভিয়েত সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির দুইবার ভাগ হয়ে যাওয়া এবং তার পরেই সত্তরের বিপ্লব স্বপ্ন যা এতটাই বিশুদ্ধ যে তাতে ভ্রাতৃহত্যা অপরাধ না, রাষ্ট্রীয়

সন্ত্রাসের মুখে বাম ঐক্য গড়ে তুলতে না পারার ব্যর্থতা কোনো ব্যর্থতা না, বিশুদ্ধতা চর্চার অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র, তাহলে তাঁদের সেই ভাবনা কিছুটা রোমান্টিক সরলীকরণ তো বটেই। কারণ এর হাত ধরেই এরপর আসবে একদিকে শুধুই হতাশা, অপরদিকে নির্বাচিত রাজ্য সরকার হিসেবে ক্রমশ পাঁকে নিমজ্জিত হওয়া এবং সোভিয়েত পতনের পরে বামপন্থার শবযাত্রা ছাড়া অন্য কিছুই দেখতে না পাওয়া— এইভাবে যাঁরা ইতিহাস দেখেন, তাঁদের সমর্থন করা সম্ভব নয়। কারণ হিসাবে এটুকুই আপাতত বলার যে এমনকী মতাদর্শের ইতিহাসও কোনো একটা সময়ে বিশুদ্ধতার শুচিবায়ুগ্রস্ততা থেকে মুক্ত হবে, এটুকু আশা রাখি। না-হলে শুধু যে সাম্প্রদায়িকতাকে, অর্থনৈতিক আগ্রাসনকে ঠেকানো অসম্ভব হবে তাই না, এটা এখন খুব পরিষ্কার করে বোঝা দরকার যে ভাবনার বিশুদ্ধতা কখনোই অন্তত নাগরিক ইতিহাসের মূল আধার হতে পারে না, কারণ ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকা জীবন ও ভাবনার বৈচিত্র্যই নগরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই বিশুদ্ধ রোমান্টিকতা শুধুমাত্র কল্লোলের একার দুর্বলতা নয়। বেশ কয়েকটা প্রজন্মই বিশুদ্ধ বামপন্থা নামক সোনার পাথরবাটির অন্বেষণে গিয়ে শেষমেষ হতাশায় নিমজ্জিত হয়েছে, যেখানে নাগরিক ইতিহাস অনেক বেশি জটিল। কিন্তু কল্লোলের সম্ভবত সবথেকে বড়ো সম্পদ তাঁর সততা। তাই অনায়াসে নকশালপন্থী নেতাদের সম্বন্ধে তিনি বলতে পারেন 'একসাথে পাঁচজনকে নিয়ে মিটিং করার ক্ষমতা যাদের ছিল না এতদিন, তারা মিটিং-এ আশি-নব্বইজন দেখে ভাবছে, এই বেলা বিপ্লবটাই সেরে ফেলা যাক।' আবার সেই কল্লোলই অনায়াস উচ্চারণে বলতে পারেন, বামফ্রন্ট আসবার পর কীভাবে শ্বাস নেবার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। কীভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন আবার একটু একটু করে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ফিরে পেল বদলানো সময়ে। এই সততা, অকুন্ঠ আত্ম-সমালোচনা এবং রাজনীতিকে তার বহুস্তরীয় আঙ্গিকে রেখে বিচার করবার মধ্যে দিয়ে বইটি সার্থকতা লাভ করেছে। শ্মশানের ধারের আড্ডা, আদিগঙ্গার ধারের চোলাইয়ের ঠেকের ওপর পেটো টেস্টিং-এর কৌতুকপ্রদ বয়ান, দেওয়াল লিখন নামক শিল্পটির নিখুঁত বর্ণনা, অথবা শ্মশানের পাশের ঘুগনির দোকানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের হঠাৎ আগমন (কবিকণ্ঠে 'অবনী বাড়ি আছো' আবৃত্তি শুনে সকলে যখন অভিভূত নিস্তব্ধ, শুধুমাত্র জনৈক মাতাল অস্ফুটে বলে উঠেছিল 'এত বার করে ডাকলেন, হারামি সাড়াই দিল না'!), যেন তুলির টানে কল্লোল এঁকে দিয়েছেন কালীঘাটের দিনলিপি। আবার মজা লাগে, যখন একই অঞ্চলের কথকতা করতে গিয়ে কোনো কোনো চরিত্রের নাম দুই বইতেই এসে পড়ে। যেমন বকেয়া অথবা শ্মশান স্বপন। যেন দুটি টেক্সট পরস্পরের উপর ছায়া ফেলছে। দুম করে তখন বুঝতে পারি যে আসলে যা পড়ছি সেটা ইতিহাসই। সাহিত্য? অবশ্যই। উত্তম সাহিত্য। কিন্তু কে ঠিক করে দিয়েছে যে উত্তম সাহিত্য কখনো ইতিহাস হতে পারে না?

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় দুটি বইয়ের শেষটুকু। সঞ্জয় কল্পনা করেছেন যে কালীঘাট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। কয়েক দিন ধরেই আকাশ লালচে হয়ে উঠছিল। রাত্রে আলিপুর চিড়িয়াখানায় সারসের দল পেঁচার মতো ডাকতে লাগল। স্ট্রবেরি জংশনের মাথায় যে হাওয়া মোরগ ছিল তার পাশে এসে বসল এক নগ্ন রাতপরি। ধীরে ধীরে পাখিরা কালীঘাট ত্যাগ করতে লাগল। এলাকার সমস্ত সারমেয়রা নতমুখে বসে থাকল মন্দিরের সামনে। মানুষ হারিয়ে ফেলল তাদের স্মৃতি এবং চলনক্ষমতা। এবং একটি হাওয়ার অভেদ্য পাঁচিল গোটা এলাকাটাকে ঘিরে ফেলল, যার ফলে কোনো দমকল, সৈন্যবাহিনী অথবা ট্যাঙ্ক কালীঘাটে আর প্রবেশ করতে পারল না। তারপর এক তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে সমস্ত এলাকাটার সলিল সমাধি ঘটে গেল। সেই প্রবল প্লাবন গিলে খেল কেওড়াতলা বাজার, হকার্স কর্নার ও কালীঘাটের গির্জা। ঠিক যেন কুরুবংশ ধ্বংসকে প্রত্যক্ষ করবেন জেনেই আধুনিক পার্থসারথি বহমান কালপ্রতিমায় অন্যরকম চক্ষুদান করলেন। প্রতিটা অপ্রত্যাশিত মুহূর্তকে মার্কাস টাইরেসিয়াস বা কৃষ্ণের মতো পড়তে থাকলেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। স্ব-সমাজের মর্মান্তিক অদৃষ্টলিপি পাঠ করলেন। আর এখানেই এই পাঠ নবারুণ ভট্টাচার্যের লুব্ধকের থেকে অথবা মার্কেজের একশো বছরের নিঃসঙ্গতার অন্তিমের স্মৃতিনাশী ঝড়ের থেকে চরিত্রে আলাদা হয়ে গেল। কারণ আত্মধ্বংশী সময়ের কোনো নিরাময় সঞ্জয় আমাদের দিয়ে গেলেন না। এই ধ্বংসের বিবরণ আসলে ঐতিহ্যের সঙ্গে এক পূর্ণচ্ছেদ ঘোষণা করল, যার উত্তরাধিকার আপাতত আমাদের খোলা হাওয়ার নষ্টপ্রজন্ম বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

কল্লোলের বই শেষ হয় এক পরাজয়ের বিবরণ দিয়ে। ১৯৮৫ সালের কর্পোরেশন ভোটে পিপিএফ-এর নকশালপন্থী কর্মীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে স্বল্প ক্ষমতা নিয়েই তাঁরা কালীঘাট অঞ্চলে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেবেন। দিয়েছিলেন এবং হিসেব মতোই হেরেছিলেন। পরাজয়ের খবরের পর কার্যালয়ের অফিসের সামনে সকলে যখন মুহ্যমান বসে আছেন, দূর থেকে দেখা গেল সিপিআই(এম)-এর বিজয় মিছিল এগিয়ে আসছে। তাদের মুখে জয়ের স্লোগান, আচরণে উল্লাস। কিন্তু পিপিএফ কর্মীদের সামনে এসে তাঁরা চুপ করে গেলেন। এতগুলো বছর ধরে যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে আসছিলেন, সাম্প্রতিক ভোটে তাঁদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা হয়তো একে অপরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করবার

জন্য তখনও যথেষ্ট ছিল না। তাই মিছিলের স্লোগান থেমে গিয়েছিল। নীরবে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে অনেকটা দূর চলে যাবার পর আবার স্লোগান উঠেছিল। 'হয়তো কোথাও পারস্পরিক সম্মানের মূল্যবোধ তখনও বেঁচে ছিল।' দুই দলের দুটো আলাদা দিকে চলে যাওয়া, এটাও হয়তো একটা রূপক। কিছুটা এলোমেলোভাবেই বামপন্থীদের যে ঐক্য এসেছিল সেই সময়টাতে, তার পর থেকেই তাতে একটা পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেল। আজ দুজনার দুটি পথ যেন দুইদিকে গেছে বেঁকে, এবং সেই বাঁক আর কখনো সমে এসে মেলেনি। একটা যুগের অবসান ঘটল, আর কালচেতনাকে যদি ভারতীয় দর্শনের রীতি মেনেই স্থানিক পরম্পরার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে, তাহলে এটাও ভাবাই যায় যে যুগের অবসানের সঙ্গেই অন্তিম সাধিত হল সেই কালীঘাটের। এর পরেও কালীঘাট আসবে, কিন্তু সেটা অন্য সময়ের অন্য কল্লোলের গল্প হবে। ব্যাসদেব যেমন বলেছিলেন, 'আমি আমার মহাভারতের কাহিনি সমাপ্ত করলাম, আমার পরে যাঁরা আসবেন তাঁরা তাঁদের মহাভারতের কাহিনি বলবেন'। বুনো স্ট্রবেরির সর্বগ্রাসী প্রলয়োন্মুখ অন্তের পাশে কল্লোলের একান্ত ব্যক্তিগত কালীঘাট ধ্বংসের কাহিনিটুকু কিছুটা মেদুর, যার সঙ্গে জুড়ে থাকে ব্যর্থতা ও বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা। কিন্তু, কোনো হনন সর্বাত্মক বলেই অধিক ভয়ংকর আর কোনো বিনাশ ব্যক্তিগত হবার কারণে স্বল্প-অভিঘাতসম্পন্ন, সেই বিচার করবার আমরা কেউ নেই। কোথাও কোথাও পাঠককেও আখ্যানের বহির্দুয়ারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, জাজমেন্ট নামক চপ্পলটিকে পা থেকে খুলে ফেলেই।

এই বইদুটো বার বার পড়তে হবে। কারণ দুই টেক্সটেরই তলায় তলায় একটা রাজনৈতিক ভাষ্য চলছে, যেটা সিপিআই(এম) বা নকশালপন্থী রাজনীতির থেকে আরো অনেক ব্যাপক। গিলে ফেলার আগে, ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার আগে মধ্যবিত্তের কলকাতাকে মনে করিয়ে দেওয়ার রাজনীতি। তখন একটা পাড়া ছিল। রিফিউজি প্রজন্মের শীতাতপ ছিল কলকাতার লোডশেডিং। রোচনাকে প্রেমের চিঠি পাঠিয়ে দুরুদুরু বুকে বসে থাকা একটা প্রজন্ম, তিন বোনের ভাঙাচোরা চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া তরুণের দল এক সময়কার চেনা মুরগির মাংসের দোকান উঠে গিয়ে তার জায়গা নিয়ে ফেলা আরামবাগ চিকেন, এই সমস্তই বার বার বলছে লোডশেডিং আর সাউথ সিটির মাঝখানে একটা দশক আছে। যে দশকের পরে হুড়মুড় করে 'মাম্মি-ড্যাডি-বেটা', র‍্যাংলার আর সিসিডি আসবে, তার প্রস্তুতির কথা বলেছে এই আখ্যানদুটো।

এই বইদুটো পড়া দরকার। পিছিয়ে পড়ার ভয় ঢোকার আগে দিনগুলো কেমন ছিল জানার জন্য পড়া দরকার। একটা আনস্মার্ট সময় কীভাবে ছিপছিপে ক্রেডিট কার্ডের দিকে এগিয়ে গেল... আর মন্দির শ্মশান আদিগঙ্গার বুকে লুকোনো রইল তার বিদ্রোহ বিপ্লব ভালোবাসার তারুণ্য।

শুধু এইটুকুর জন্যই পড়া দরকার।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, *বুনো স্ট্রবেরি*, দে'জ পাবলিশিং

তক্কোগুলি, চরিতাবলী ও আখ্যানসমূহ— কল্লোল। গুরুচণ্ডালি প্রকাশনা

চিঠির বাক্সো

এই সংখ্যায় (১-১৫ মার্চ, ২০১৯) সমসাময়িক বিভাগে 'শাসকের ভয়াল রূপ' লেখাটির জন্য ধন্যবাদ। অনীক দত্ত একজন প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র-পরিচালক হয়েও যে শাসকের কাছ থেকে পার পেলেন না,— তাঁর পরের ছবি 'ভবিষ্যতের ভূত' যে দেখানো গেল না— এটাই প্রমাণ করে শাসকের প্রকৃত রূপ কতখানি ভয়াবহ।

ইতিমধ্যে স্বস্তির ঘটনা যা ঘটেছে তা হল অনেকেই 'ভবিষ্যতের ভূত' ছবিটি 'উপরের নির্দেশে' বন্ধ করে দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একাধিক ছোটোখাটো জমায়েত হয়েছে, একটি মিছিলও বেরিয়েছে দেখলাম। এবং মিছিলটিতে হেঁটেছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রবীণতম স্বনামধন্য অভিনেতা ও নাট্যব্যক্তিত্ব শ্রী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর পাশে অভিনেত্রী-পরিচালক শ্রীমতী অপর্ণা সেন। আর কারা ছিলেন বা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়নি বলে আমাদের জানা হয়নি। তবে এই সংবাদে অনেকখানি হতাশা কেটে গেছে। যাঁরা এই সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন তাঁরা যে অন্যায় জেনেও তার প্রতিবাদে অংশ নেবেন না তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু কেউ কেউ আছেন— নিশ্চয় অনেকেই আছেন— যাঁরা শাসকের এই অসভ্যতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। হয়তো ভয়ের মধ্যেই তাঁরা মাথা তুলেছেন। ভয়ের মধ্যেই তো— ভয়কে অস্বীকার করার মধ্যেই তো— মাথা তুলে দাঁড়ানোর প্রশ্ন আসে।

ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষিত হয়েছে। এই শাসকের হাত থেকে মুক্তি পাবার একটা আভাস আসবে আশা করা যায়, যদি শাসকদলের গুন্ডাবাহিনীকে নির্বাচন কমিশন দমন করে রাখতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এই শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করতে আরো কিছুদিন অপেক্ষায় থাকতেই হবে। অর্থাৎ শাসকের রক্তচক্ষুর নীচে আরও কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গবাসীকে 'মুক্তির জন্য' অপেক্ষা করতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, মানুষ নির্ভয়ে ইচ্ছেমতো ভোট দেবেন এটাই সর্বাগ্রে কাম্য। তবে যদি চাওয়ার থাকে যে রাজনীতিতে নৈতিকতা ফিরে আসুক তাহলে নিঃসন্দেহে বামপন্থীদের সমর্থন করতে হবে। একজন বিমান বসু বা একজন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বা সূর্যকান্ত মিশ্রের মতো সৎ মানুষ বামপন্থী দলগুলির বাইরে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

অভিজিৎ সরকার
বিধাননগর

পুনঃপাঠ

পূর্ব ও পশ্চিম

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের ইতিহাস।

একদিন যে শ্বেতকায় আর্যগণ প্রকৃতির এবং মানুষের সমস্ত দুরূহ বাধা ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, যে অন্ধকারময় সুবিস্তীর্ণ অরণ্য এই বৃহৎ দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া পূর্বে পশ্চিমে প্রসারিত ছিল তাহাকে একটা নিবিড় যবনিকার মতো সরাইয়া দিয়া ফলশস্যে-বিচিত্র আলোকময় উন্মুক্ত রঙ্গভূমি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাঁহাদের বুদ্ধিশক্তি ও সাধনা একদিন এই ইতিহাসের ভিত্তিরচনা করিয়াছিল। কিন্তু, এ কথা তাঁহারা বলিতে পারেন নাই যে, ভারতবর্ষ আমাদেরই ভারতবর্ষ।

আর্যরা অনার্যদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিলেন। প্রথম যুগে আর্যদের প্রভাব যখন অক্ষুণ্ণ ছিল, তখনো অনার্য শূদ্রদের সহিত তাঁহাদের প্রতিলোম বিবাহ চলিতেছিল। তার পর বৌদ্ধযুগে এই মিশ্রণ আরো অবাধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই যুগের অবসানে যখন হিন্দুসমাজ আপনার বেড়াগুলি পুনঃসংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং খুব শক্ত পাথর দিয়া আপন প্রাচীর পাকা করিয়া গাঁথিতে চাহিল, তখন দেশের অনেক স্থলে এমন অবস্থা ঘটিয়াছিল যে, ক্রিয়াকর্ম পালন করিবার জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল; অনেক স্থলে ভিন্নদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলে রাজাজ্ঞায় উপবীত পরাইয়া ব্রাহ্মণ রচনা করিতে হইয়াছে, এ কথা প্রসিদ্ধ। বর্ণের যে-শুভ্রতা লইয়া একদিন আর্যরা গৌরব বোধ করিয়াছিলেন সে-শুভ্রতা মলিন হইয়াছে; এবং আর্যগণ শূদ্রদের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাদের বিবিধ আচার ও ধর্ম, দেবতা ও পূজাপ্রণালী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে সমাজের অন্তর্গত করিয়া লইয়া হিন্দুসমাজ বলিয়া এক সমাজ রচিত হইয়াছে; বৈদিক সমাজের সহিত কেবল যে তাহার ঐক্য নাই তাহা নহে অনেক বিরোধও আছে।

অতীতের সেই পর্বেই কি ভারতবর্ষের ইতিহাস দাঁড়ি টানিতে পারিয়াছে। বিধাতা কি তাহাকে এ কথা বলিতে দিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের ইতিহাস হিন্দুর ইতিহাস। হিন্দুর ভারতবর্ষে যখন রাজপুত রাজারা পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া বীরত্বের আত্মঘাতী অভিমান প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভারতবর্ষের সেই বিচ্ছিন্নতার ফাঁক দিয়া মুসলমান এ দেশে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং পুরুষানুক্রমে জন্মিয়া ও মরিয়া এ দেশের মাটিকে আপন করিয়া লইল।

যদি এইখানেই ছেদ দিয়া বলি, বাস, আর নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আমরা হিন্দুমুসলমানেরই ইতিহাস করিয়া তুলিব, তবে, যে-বিশ্বকর্মা মানবসমাজকে সংকীর্ণ কেন্দ্র হইতে ক্রমশই বৃহৎ পরিধির দিকে গড়িয়া তুলিতেছেন, তিনি কি তাঁহার প্ল্যান বদলাইয়া আমাদেরই অহংকারকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

ভারতবর্ষ আমার হইবে কি তোমার হইবে, হিন্দুর হইবে কি মুসলমানের হইবে, কি আর কোনো জাত আসিয়া এখানে আধিপত্য করিবে, বিধাতার দরবারে যে সেই কথাটাই সবচেয়ে বড়ো করিয়া আলোচিত হইতেছে, তাহা নহে। তাঁহার আদালতে নানা পক্ষের উকিল নানা পক্ষের দরখাস্ত লইয়া লড়াই করিতেছে, অবশেষে একদিন মোকদ্দমা শেষ হইলে পর হয় হিন্দু নয় মুসলমান নয় ইংরেজ নয় আর-কোনো জাতি চূড়ান্ত ডিক্রি পাইয়া নিশান-গাড়ি করিয়া বসিবে, এ কথা সত্য নহে। আমরা মনে করি জগতে স্বত্বের লড়াই চলিতেছে, সেটা আমাদের অহংকার; লড়াই যা সে সত্যের লড়াই।

যাহা সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, যাহা সকলের চেয়ে পূর্ণ, যাহা চরম সত্য, তাহা সকলকে লইয়া; এবং তাহাই নানা আঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিবার দিকে চলিয়াছে—আমাদের সমস্ত ইচ্ছা দিয়া তাহাকেই আমরা যে-পরিমাণে অগ্রসর করিতে চেষ্টা করিব, সেই পরিমাণেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে; নিজেকেই—ব্যক্তি হিসাবেই হউক আর জাতি হিসাবেই হউক—জয়ী করিবার যে চেষ্টা, বিশ্ববিধানের মধ্যে তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। গ্রিসের জয়পতাকা আলেকজান্ডারকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে যে একচ্ছত্র করিতে পারে নাই, তাহাতে গ্রিসের দম্ভই অকৃতার্থ হইয়াছে; পৃথিবীতে আজ সে-দম্ভের মূল্য কী। রোমের বিশ্বসাম্রাজ্যের আয়োজন বর্বরের সংঘাতে ফাটিয়া

খানখান হইয়া সমস্ত য়ুরোপময় যে বিকীর্ণ হইল, তাহাতে রোমকের অহংকার অসম্পূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু সেই ক্ষতি লইয়া জগতে আজ কে বিলাপ করিবে। গ্রিস এবং রোম মহাকালের সোনার তরীতে নিজের পাকা ফসল সমস্তই বোঝাই করিয়া দিয়াছে; কিন্তু তাহারা নিজেরাই সেই তরণীর স্থান আশ্রয় করিয়া আজ পর্যন্ত যে বসিয়া নাই, তাহাতে কালের অনাবশ্যক ভার লাঘব করিয়াছে মাত্র, কোনো ক্ষতি করে নাই।

ভারতবর্ষেও যে-ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে এ-ইতিহাসের শেষ তাৎপর্য এ নয় যে, এ দেশে হিন্দুই বড়ো হইবে বা আর কেহ বড়ো হইবে। ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতায় মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে—ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই। এই পরিপূর্ণতার প্রতিমা গঠনে হিন্দু মুসলমান বা ইংরেজ যদি নিজের বর্তমান বিশেষ আকারটিকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহাতে স্বাজাতিক অভিমানের অপমৃত্যু ঘটিতে পারে, কিন্তু সত্যের বা মঙ্গলের অপচয় হয় না।

আমরা বৃহৎ ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আছি। আমরা তাহার একটা উপকরণ। কিন্তু উপকরণ যদি এই বলিয়া বিদ্রোহ প্রকাশ করিতে থাকে যে, আমরাই চরম, আমরা সমগ্রের সহিত মিলিব না, আমরা স্বতন্ত্র থাকিব, তবে সকল হিসাবেই ব্যর্থ হয়। বিরাট রচনার সহিত যে-খণ্ড সামগ্রী কোনোমতেই মিশ খাইবে না, যে বলিবে আমিই টিঁকিতে চাই, সে একদিন বাদ পড়িয়া যাইবে। যে বলিবে আমি স্বয়ং কিছুই নই, যে-সমগ্র রচিত হইতেছে তাহারই উদ্দেশে আমি সম্পূর্ণভাবে উৎসৃষ্ট, ক্ষুদ্রকে সে-ই ত্যাগ করিয়া বৃহতের মধ্যে রক্ষিত হইবে। ভারতবর্ষেরও যে-অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো-একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্যসকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন। কারণ ভারতবর্ষের ইতিহাস আমাদেরই ইতিহাস নহে, আমরাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সমাহৃত; আমরা নিজেকে যদি তাহার যোগ্য না করি, তবে আমরাই নষ্ট হইব। আমরা সর্বপ্রকারে সকলের সংস্রব বাঁচাইয়া অতি বিশুদ্ধভাবে স্বতন্ত্র থাকিব, এই বলিয়া যদি গৌরব করি এবং যদি মনে করি এই গৌরবকেই আমাদের বংশপরম্পরায় চিরন্তন করিয়া রাখিবার ভার আমাদের ইতিহাস গ্রহণ করিয়াছে, যদি মনে করি আমাদের ধর্ম কেবলমাত্র আমাদেরই, আমাদের আচার বিশেষভাবে আমাদেরই, আমাদের পূজাক্ষেত্রে আর কেহ পদার্পণ করিবে না, আমাদের জ্ঞান কেবল আমাদেরই লৌহপেটকে আবদ্ধ থাকিবে, তবে না জানিয়া আমরা এই কথাই বলি যে, বিশ্বসমাজে আমাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইয়া আছে—এক্ষণে তাহারই জন্য আত্মরচিত কারাগারে অপেক্ষা করিতেছি।

সম্প্রতি পশ্চিম হইতে ইংরেজ আসিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই ঘটনা অনাহূত আকস্মিক নহে। পশ্চিমের সংস্রব হইতে বঞ্চিত হইলে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইত। য়ুরোপের প্রদীপের মুখে শিখা এখন জ্বলিতেছে। সেই শিখা হইতে আমাদের প্রদীপ জ্বালাইয়া লইয়া আমাদিগকে কালের পথে আর-একবার যাত্রা করিয়া বাহির হইতে হইবে। বিশ্বজগতে আমরা যাহা পাইতে পারি, তিন হাজার বৎসর পূর্বেই আমাদের পিতামহেরা তাহা সমস্তই সঞ্চয় করিয়া চুকাইয়া দিয়াছেন, আমরা এমন হতভাগ্য নহি এবং জগৎ এত দরিদ্র নহে; আমরা যাহা করিতে পারি, তাহা আমাদের পূর্বেই করা হইয়া গেছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে জগতের কর্মক্ষেত্রে আমাদের প্রকাণ্ড অনাবশ্যকতা লইয়া আমরা তো পৃথিবীর ভার হইয়া থাকিতে পারিব না। যাহারা প্রপিতামহদের মধ্যেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সমাপ্ত বলিয়া জানে, এবং সমস্ত বিশ্বাস এবং আচারের দ্বারা আধুনিকের সংস্পর্শ হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে চেষ্টা করে, তাহারা নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবে কোন বর্তমানের তাড়নায়, কোন ভবিষ্যতের আশ্বাসে। পৃথিবীতে আমাদেরও যে প্রয়োজন আছে, সে-প্রয়োজন আমাদের নিজের ক্ষুদ্রতার মধ্যেই বদ্ধ নহে, তাহা নিখিল মানুষের সঙ্গে জ্ঞান প্রেম কর্মের নানা পরিবর্ধমান সম্বন্ধে, নানা উদ্‌ভাবনে, নানা প্রবর্তনায় জাগ্রত থাকিবে ও জাগরিত করিবে; আমাদের মধ্যে সেই উদ্যম সঞ্চার করিবার জন্য ইংরেজ জগতের যজ্ঞেশ্বরের দূতের মতো জীর্ণদ্বার ভাঙিয়া আমাদের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহাদের আগমন যে-পর্যন্ত না সফল হইবে, জগতযজ্ঞের নিমন্ত্রণে তাহাদের সঙ্গে যে-পর্যন্ত না যাত্রা করিতে পারিব, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদিগকে পীড়া দিবে, তাহারা আমাদিগকে আরামে নিদ্রা যাইতে দিবে না।

ইংরেজের আহ্বান যে-পর্যন্ত আমরা গ্রহণ না করিব, তাহাদের সঙ্গে মিলন যে-পর্যন্ত না সার্থক হইবে, সে-পর্যন্ত তাহাদিগকে বলপূর্বক বিদায় করিব, এমন শক্তি আমাদের নাই। যে-ভারতবর্ষ অতীতে অঙ্কুরিত হইয়া ভাবিষ্যতের অভিমুখে উদ্‌ভিন্ন হইয়া উঠিতেছে, ইংরেজ সেই ভারতের জন্য প্রেরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই ভারতবর্ষ সমস্ত মানুষের ভারতবর্ষ—আমরা সেই ভারতবর্ষ হইতে অসময়ে ইংরেজকে দূর করিব, আমাদের এমন কী অধিকার আছে। বৃহৎ ভারতবর্ষের আমরা

কে। এ কি আমাদেরই ভারতবর্ষ। সেই আমরা কাহারা। সে কি বাঙালি, না মারাঠি, না পাঞ্জাবি, হিন্দু না মুসলমান? একদিন যাহারা সম্পূর্ণ সত্যের সহিত বলিতে পারিবে, আমরাই ভারতবর্ষ, আমরাই ভারতবাসী—সেই অখণ্ড প্রকাণ্ড আমরা'র মধ্যে যে-কেহই মিলিত হউক, তাহার মধ্যে হিন্দু মুসলমান ইংরেজ অথবা আরো যে কেহ আসিয়াই এক হউক না, তাহারাই হুকুম করিবার অধিকার পাইবে এখানে কে থাকিবে আর কে না থাকিবে।

ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন সার্থক করিতে হইবে। মহাভারতবর্ষ গঠন ব্যাপারে এই ভার আজ আমাদের উপরে পড়িয়াছে। বিমুখ হইব, বিচ্ছিন্ন হইব, কিছুই গ্রহণ করিব না, এ কথা বলিয়া আমরা কালের বিধানকে ঠেকাইতে পারিব না, ভারতের ইতিহাসকে দরিদ্র ও বঞ্চিত করিতে পারিব না।

অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড়ো মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন রায়। তিনি মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপরে ভারতবর্ষকে সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য একদিন একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন। কোনো প্রথা কোনো সংস্কার তাঁহার দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে নাই। আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনিই একলা সকল দিকেই নব্যবঙ্গের পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন। এইরূপে তিনিই স্বদেশের লোকের সকল বিরোধ স্বীকার করিয়া আমাদের জ্ঞানের ও কর্মের ক্ষেত্রকে পূর্ব হইতে পশিচমের দিকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; আমাদিগকে মানবের চিরন্তন অধিকার, সত্যের অবাধ অধিকার দান করিয়াছেন; আমাদিগকে জানিতে দিয়াছেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর; আমাদেরই জন্য বুদ্ধ খ্রিস্ট মহম্মদ জীবন গ্রহণ ও জীবন দান করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ঋষিদের সাধনার ফল আমাদের প্রত্যেকের জন্যই সঞ্চিত হইয়াছে; পৃথিবীর যে-দেশেই যে-কেহ জ্ঞানের বাধা দূর করিয়াছেন, জড়ত্বের শৃঙ্খল মোচন করিয়া মানুষের আবদ্ধ শক্তিকে মুক্তি দিয়াছেন, তিনি আমাদেরই আপন, তাঁহাকে লইয়া আমরা প্রত্যেকে ধন্য। রামমোহন রায় ভারতবর্ষের চিত্তকে সংকুচিত ও প্রাচীরবদ্ধ করেন নাই, তাহাকে দেশে ও কালে প্রসারিত করিয়াছেন, ভারতবর্ষ ও য়ুরোপের মধ্যে তিনি সেতু স্থাপন করিয়াছেন; এই কারণেই ভারতবর্ষের সৃষ্টিকার্যে আজও তিনি শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। কোনো অন্ধ অভ্যাস কোনো ক্ষুদ্র অহংকারবশত মহাকালের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে মূঢ়ের মতো তিনি বিদ্রোহ করেন নাই; যে-অভিপ্রায় কেবল অতীতের মধ্যে নিঃশেষিত নহে, যাহা ভবিষ্যতের দিকে উদ্যত, তাহারই জয়পতাকা সমস্ত বিঘ্নের বিরুদ্ধে বীরের মতো বহন করিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতে, রানাডে পূর্ব-পশ্চিমের সেতুবন্ধনকার্যে জীবনযাপন করিয়াছেন। যাহা মানুষকে বাঁধে, সমাজকে গড়ে, অসামঞ্জস্যকে দূর করে, জ্ঞান প্রেম ও ইচ্ছাশক্তির বাধাগুলিকে নিরস্ত করে, সেই সৃজনশক্তি সেই মিলনতত্ত্ব রানাডের প্রকৃতির মধ্যে ছিল; সেইজন্য ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যবহারবিরোধ ও স্বার্থ-সংঘাত সত্ত্বেও তিনি সমস্ত সাময়িক ক্ষোভ ক্ষুদ্রতর ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিয়াছিলেন। ভারত-ইতিহাসের যে-উপকরণ ইংরেজের মধ্যে আছে, তাহা গ্রহণের পথ যাহাতে বিস্তৃত হয়, যাহাতে ভারতবর্ষের সম্পূর্ণতাসাধনের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় ও উদার বুদ্ধি সেই চেষ্টায় চিরদিন প্রবৃত্ত ছিল।

অল্পদিন পূর্বে বাংলাদেশে যে-মহাত্মার মৃত্যু হইয়াছে, সেই বিবেকানন্দও পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণে ও বামে রাখিয়া মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্যকে অস্বীকার করিয়া ভারতবর্ষকে সংকীর্ণ সংস্কারের মধ্যে চিরকালের জন্য সংকুচিত করা তাঁহার জীবনের উপদেশ নহে। গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে যেদিন অকস্মাৎ পূর্ব-পশ্চিমের মিলনযজ্ঞ আহ্বান করিলেন, সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্যে অমরতার আবাহন হইল; সেইদিন হইতে বঙ্গসাহিত্য মহাকালের অভিপ্রায়ে যোগদান করিয়া সার্থকতার পথে দাঁড়াইল। বঙ্গসাহিত্য যে দেখিতে দেখিতে এমন বৃদ্ধিলাভ করিয়া উঠিতেছে, তাহার কারণ এ-সাহিত্য সেই-সকল কৃত্রিম বন্ধন ছেদন করিয়াছে যাহাতে বিশ্বসাহিত্যের সহিত ইহার ঐক্যের পথ বাধাগ্রস্ত হয়। ইহা ক্রমশই এমন করিয়া রচিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহাতে পশ্চিমের জ্ঞান ও ভাব ইহা সহজে আপনারই করিয়া গ্রহণ করিতে পারে। বঙ্কিম যাহা রচনা করিয়াছেন কেবল তাহার জন্যই যে তিনি বড়ো তাহা নহে, তিনিই বাংলাসাহিত্যে পূর্ব-পশ্চিমের আদানপ্রদানের রাজপথকে প্রতিভাবলে ভালো করিয়া মিলাইয়া দিতে পারিয়াছেন। এই মিলনতত্ব বাংলাসাহিত্যের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইহার সৃষ্টিশক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে।

এমনি করিয়া আমরা যে দিক হইতে দেখিব, দেখিতে পাইব আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশিচম তাঁহাদের জীবনে বিরুদ্ধ ও পীড়িত হইবে না, পূর্ব ও পশিচম তাঁহাদের মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।

শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। এমন করিয়া যে-জিনিসটা বড়ো তাহাকে আমরা ছোটোর দাস করিয়া দেখিতেছি। ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব। মিলিতে যে পারিতেছি না ইহাতে আমাদের মনুষ্যত্বের মূলনীতি ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সুতরাং সর্বপ্রকার শক্তিই ক্ষীণ হইয়া সর্বত্রই বাধা পাইতেছে; ইহা আমাদের পাপ, ইহাতে আমাদের ধর্ম নষ্ট হইতেছে বলিয়া সকলই নষ্ট হইতেছে।

সেই ধর্মবুদ্ধি হইতে এই মিলনচেষ্টাকে দেখিলে তবেই এই চেষ্টা সার্থক হইবে। কিন্তু ধর্মবুদ্ধি তো কোনো ক্ষুদ অহংকার বা প্রয়োজনের মধ্যে বদ্ধ নহে। সেই বুদ্ধির অনুগত হইলে আমাদের মিলনচেষ্টা কেবল যে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্রজাতির মধ্যেই বদ্ধ হইবে তাহা নহে, এই চেষ্টা ইংরেজকেও ভারতবর্ষের করিয়া লইবার জন্য নিয়ত নিযুক্ত হইবে।

সম্প্রতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের শিক্ষিত, এমনকি অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও যে বিরোধ জন্মিয়াছে, তাহাকে আমরা কীভাবে গ্রহণ করিব। তাহার মধ্যে কি কোনো সত্য নাই। কেবল তাহা কয়েকজন চক্রান্তকারীর ইন্দ্রজাল মাত্র? ভারতবর্ষের মহাক্ষেত্রে যে নানা জাতি ও নানা শক্তির সমাগম হইয়াছে, ইহাদের সংঘাতে সম্মিলনে যে ইতিহাস গঠিত হইয়া উঠিতেছে বর্তমান বিরোধের আবর্ত কি একেবারেই তাহার প্রতিকূল। এই বিরোধের তাৎপর্য কী তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে।

আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বে বিরোধকেও মিলনসাধনার একটা অঙ্গ বলা হয়। লোকে প্রসিদ্ধি আছে যে, রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না। এইজন্য সন্দেহ এবং প্রতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত কঠোরভাবে লড়াই করিয়া তবেই বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করে।

আমরা একদিন মুগ্ধভাবে জড়ভাবে য়ুরোপের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলাম। আমাদের বিচারবুদ্ধি একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিল; এমন করিয়া যথার্থভাবে লাভ করা যায় না। জ্ঞানই বলো আর রাষ্ট্রীয় অধিকারই বলো, তাহা উপার্জনের অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ বিরোধ ও ব্যাঘাতের ভিতর দিয়া আত্মশক্তির দ্বারা লাভ করিলেই তবে তাহার উপলব্ধি ঘটে; কেহ তাহা আমাদের হাতে তুলিয়া দিলে তাহা আমাদের হস্তগত হয় না। যে-ভাবে গ্রহণে আমাদের অবমাননা হয়, সে-ভাবে গ্রহণ করিলে ক্ষতিই হইতে থাকে।

এইজন্যই কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের বিরুদ্ধে আমাদের মনে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। একটা আত্মাভিমান জন্মিয়া আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া নিজের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে।

যে-মহাকালের অভিপ্রায়ের কথা বলিয়াছি, সেই অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়াই এই আত্মাভিমানের প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। আমরা নির্বিচারে নির্বিরোধে দুর্বলভাবে দীনভাবে যাহা হইতেছিলাম, তাহা যাচাই করিয়া তাহার মূল্য বুঝিয়া তাহাকে আপন করিতে পারিতেছিলাম না, তাহা বাহিরের জিনিস পোশাকি জিনিস হইয়া উঠিতেছিল বলিয়াই আমাদের মধ্যে একটা পশ্চাদ্‌বর্তনের তাড়না আসিয়াছে।

রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই; তাঁহার আপনার দিকে দূর্বলতা ছিল না। তিনি নিজের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বাহিরের সামগ্রী আহরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ঐশ্চর্য কোথায় তাহা তাঁহার অগোচর ছিল না, এবং তাহাকে তিনি নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন; এইজন্যই যেখান হইতে যাহা পাইয়াছেন, তাহা বিচার করিবার নিক্তি ও মানদন্ড তাঁহার হাতে ছিল; কোনো মূল্য না বুঝিয়া তিনি মুগ্ধের মতো আপনাকে বিকাইয়া দিয়া অঞ্জলিপূরণ করেন নাই।

যে-শক্তি নব্যভারতের আদি-অধিনায়কের প্রকৃতির মধ্যে সহজেই ছিল, আমাদের মধ্যে তাহা নানা ঘাতপ্রতিঘাতে ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণে সেই চেষ্টা পর্যায়ক্রমে বিপরীত সীমার চূড়ান্তে গিয়া ঠেকিতেছে। একান্ত অভিমুখতা এবং একান্ত বিমুখতায় আমাদের গতিকে আঘাত করিতে করিতে আমাদিগকে লক্ষ্যপথে লইয়া চলিয়াছে।

বর্তমানে ইংরেজ-ভারতবাসীর যে-বিরোধ জাগিয়া উঠিয়াছে তাহার একটা কারণ এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব; ইংরেজের জ্ঞান ও শক্তিকে ক্রমাগত নিশ্চেষ্টভাবে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে করিতে আমাদের অন্তরাত্মা পীড়িত হইয়া উঠিতেছিল। সেই পীড়ার মাত্রা অলক্ষিতভাবে জমিতে জমিতে আজ হঠাৎ দেশের অন্তঃকরণ প্রবলবেগে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কারণ শুধু এই একটিমাত্র নহে। ভারতবর্ষের গৃহের মধ্যে পশ্চিম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; তাহাকে কোনোমতেই ব্যর্থ ফিরাইয়া দিতে পারিব না, তাহাকে আপনার শক্তিতে আপনার করিয়া লইতে হইবে। আমাদের তরফে সেই আপন করিয়া লবার আত্মশক্তির যদি অভাব ঘটে, তবে তাহাতে কালের অভিপ্রায়বেগ ব্যাঘাত পাইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিবে। আবার অন্যপক্ষেও পশ্চিম যদি নিজেকে সত্যভাবে প্রকাশ করিতে কৃপণতা করে, তবে তাহাতেও বিক্ষোভ উপস্থিত হইবে।

ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ সত্য তাহার সহিত আমাদের যদি সংস্রব না ঘটে, ইংরেজের মধ্যে যদি প্রধানত আমরা সৈনিকের বা বণিকের পরিচয় পাই, অথবা যদি কেবল শাসনতন্ত্রচালকরূপে তাহাকে আপিসের মধ্যে যন্ত্রারূঢ় দেখিতে থাকি, যে-ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষ আত্মীয়ভাবে মিশিয়া পরস্পরকে অন্তরে গ্রহণ করিতে পারে, সে-ক্ষেত্রে যদি তাহার সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ না থাকে, যদি পরস্পর ব্যবহৃত হইয়া পৃথক হইয়া থাকি, তবে আমরা পরস্পরের পক্ষে পরম নিরানন্দের বিষয় হইয়া উঠিবই। এরূপ স্থলে প্রবল পক্ষ সিডিশনের আইন করিয়া দুর্বল পক্ষের অসন্তোষকে লোহার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অসন্তোষকে বাঁধিয়াই রাখা হইবে, তাহাকে দূর করা হইবে না। অথচ এই অসন্তোষ কেবল এক পক্ষের নহে। ভারতবাসীর মধ্যে ইংরেজের কোনোই আনন্দই নাই। ভারতবাসীর অস্তিত্বকে ইংরেজ ক্লেশকর বলিয়া সর্বতোভাবে পরিহার করিবারই চেষ্টা করে। একটা ডেভিড হেয়ারের মতো মহাত্মা অত্যন্ত নিকটে আসিয়া ইংরেজচরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের হৃদয়ের সম্মুখে আনিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন; তখনকার ছাত্রগণ সত্যই ইংরেজজাতির নিকট হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল। এখন ইংরেজ অধ্যাপক স্বজাতির যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা কেবল যে আমাদের নিকটে আনিয়া দিতে পারেন না তাহা নহে, তাঁহারা ইংরেজের আদর্শকে আমাদের কাছে খর্ব করিয়া ইংরেজের দিক হইতে বাল্যকার হইতে আমাদের মনকে বিমুখ করিয়া দেন। তাহার ফল এই হইয়াছে, পূর্বকালের ছাত্রগণ ইংরেজের সাহিত্য ইংরেজের শিক্ষা যেমন সমস্ত মন দিয়া গ্রহণ করিত, এখনকার ছাত্ররা তাহা করে না। তাহারা গ্রাস করে, তাহারা ভোগ করে না। সেকালের ছাত্রগণ যেরূপ আন্তরিক অনুরাগের সহিত শেক্‌স্‌পীয়র বায়রনের কাব্যরসে চিত্তকে অভিষিক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাহা দেখিতে পাই না। সাহিত্যের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির সঙ্গে যে প্রেমের সম্বন্ধ সহজে ঘটিতে পারে, তাহা এখন বাধা পাইয়াছে। অধ্যাপক বলো, ম্যাজিস্টেট বলো, সদাগর বলো, পুলিশের কর্তা বলো, সকল প্রকার সম্পর্কেই ইংরেজ তাহার ইংরেজি সভ্যতার চরম অভিব্যক্তির পরিচয় অবাধে আমাদের নিকট স্থাপিত করিতেছে না—সুতরাং ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের যে-সর্বশ্রেষ্ঠ লাভ, তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভালো আইনই যে মানুষের পক্ষে সবচেয়ে বড়ো লাভ তাহা হইতে ইংরেজ আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে; আমাদের আত্মশক্তিকে বাধাগ্রস্ত এবং আত্মসম্মানকে খর্ব করিতেছে। সুশাসন এবং ভালো আইনই যে মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো লাভ তাহা নহে। আপিস আদালত আইন এবং শাসন তো মানুষ নয়। মানুষ যে মানুষকে চায়—তাহাকে যদি পায় তবে অনেক দুঃখ অনেক অভাব সহিতেও সে রাজি আছে। মানুষের পরিবর্তে বিচার এবং আইন, রুটির পরিবর্তে পাথরেরই মতো। সে-পাথর দুর্লভ এবং মূল্যবান হইতে পারে কিন্তু তাহাতে ক্ষুধা দূর হয় না।

এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমের সম্যক মিলনের বাধা ঘটিতেছে বলিয়াই আজ যত-কিছু উৎপাত জাগিয়া উঠিতেছে। কাছে থাকিব অথচ মিলিব না, এ অবস্থা মানুষের পক্ষে অসহ্য এবং অনিষ্ঠকর। সুতরাং একদিন-না-একদিন ইহার প্রতিকারের চেষ্টা দুর্দম হইয়া উঠিবেই। এ বিদোহ নাকি হৃদয়ের বিদ্রোহ, সেইজন্য ইহা ফলাফলের হিসাব বিচার করে না, ইহা আত্মহত্যা স্বীকার করিতেও প্রস্তুত হয়।

তৎসত্ত্বেও ইহা সত্য যে, এ-সকল বিদোহ ক্ষণিক। কারণ পশ্চিমের সঙ্গে আমাদিগকে সত্যভাবেই মিলিতে হইবে, এবং তাহার যাহা-কিছু গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ না করিয়া ভারতবর্ষের অব্যাহতি নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিণত হইয়া না উঠিবে, ততক্ষণ তাহাকে বোঁটায় বাঁধা থাকিতে হইবেই, এবং বোঁটায় বাঁধা না থাকিলেও তাহার পরিণতি হইবে না।

এইবার একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজের যাহা-কিছু শ্রেষ্ঠ, ইংরেজ তাহা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, সেজন্য আমারা দায়ী আছি। আমাদের দৈন্য ঘুচাইলে তবেই তাহাদেরও কৃপণতা ঘুচিবে। বাইবেলে লিখিত আছে, যাহার আছে, তাহাকেই দেওয়া হইবে।

সকল দিকেই আমাদিগকে শক্তিশালী হইতে হইবে; তবেই ভারতবর্ষকে ইংরেজ যাহা দিতে আসিয়াছে, তাহা দিতে পারিবে। যতদিন তাহারা আমাদিগকে অবজ্ঞা করিবে, ততদিন ইংরেজের সঙ্গে আমাদের মিলন হইতে পারিবে না। আমরা রিক্তহস্তে তাহাদের দ্বারে দাঁড়াইলে বারবার ফিরিয়া আসিতে হইবে।

ইংরেজের মধ্যে যাহা সকলের চেয়ে বড়ো এবং সকলের চেয়ে ভালো তাহা আরামে গ্রহণ করিবার নহে, তাহা আমাদিগকে জয় করিয়া লইতে হইবে। ইংরেজ যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রতি ভালো হয়, তবে তাহা আমাদের পক্ষে ভালো হইবে না। আমরা মনুষ্যত্ব দ্বারা তাহার মনুষ্যত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া লইব। ইহা ছাড়া সত্যকে গ্রহণ করিবার আর কোনো সহজ পন্থা নাই। এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইংরেজের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ইংরেজের কাছেও কঠিন দুঃখেই উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা দারুণ মন্থনে মথিত হয়িা উঠিয়াছে, তাহার যথার্থ সাক্ষাৎলাভ যদি করিতে চাই তবে আমাদের মধ্যেও শক্তির আবশ্যক। আমাদের মধ্যে যাহারা উপাধি বা সম্মান বা চাকরির লোভে হাত জোড় করিয়া মাথা হেঁট করিয়া ইংরেজের দরবারে

উপস্থিত হয়, তাহারা ইংরেজের ক্ষুদ্রতাকেই আকর্ষণ করে, তাহারা ভারতবর্ষের নিকট ইংরেজের প্রকাশকে বিকৃত করিয়া দেয়। অন্যপক্ষে যাহারা কাণ্ডজ্ঞানবিহীন অসংযত ক্রোধের দ্বারা ইংরেজকে উন্মত্তভাবে আঘাত করিতে চায়, তাহারা ইংরেজের পাপপ্রকৃতিকেই জাগরিত করিতা তোলে। ভারতবর্ষ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ইংরেজের লোভকে, ঔদ্ধত্যকে, ইংরেজের কাপুরুষতা ও নিষ্ঠুরতাকেই উদ্‌বোধিত করিয়া তুলিতেছে, এ যদি সত্য হয় তবে এজন্য ইংরেজকে দোষ দিলে চলিবে না, এ অপরাধের প্রধান অংশ আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বদেশে ইংরেজের সমাজ ইংরেজের নীচতাকে দমন করিয়া তাহার মহত্বকেই উদ্দীপিত রাখিবার জন্য চারিদিক হইতে নানা চেষ্টা নিয়ত প্রয়োগ করিতে থাকে, সমস্ত সমাজের শক্তি প্রত্যেককে একটা উচ্চ ভূমিতে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য অশ্রান্তভাবে কাজ করে; এমনি করিয়া মোটের উপর নিজের নিকট হইতে যত দূর পর্যন্ত পূর্ণফল পাওয়া সম্ভব, ইংরেজ-সমাজ তাহা জাগিয়া থাকিয়া বলের সহিত আদায় করিয়া লইতেছে।

এ দেশে ইংরেজের প্রতি ইংরেজ-সমাজের সেই শক্তি সম্পূর্ণ বলে কাজ করিতে পারে না। এখানে ইংরেজ সমগ্র মানুষের ভাবে কোনো সমাজের সহিত যুক্ত নাই। এখানকার ইংরেজ-সমাজ হয় সিভিলিয়ান-সমাজ, নয় বণিক-সমাজ, নয় সৈনিক-সমাজ। তাহারা তাহাদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রে সংকীর্ণতার দ্বারা আবদ্ধ। এই-সকল ক্ষেত্রের সংস্কার সকল সর্বদাই তাহাদের চারিদিকে কঠিন আবরণ রচনা করিতেছে, বৃহৎ মনুষ্যত্বের সংস্পর্শে সেই আবরণ ক্ষয় করিয়া ফেলিবার জন্য কোনো শক্তি তাহাদের চারিদিকে প্রবলভাবে কাজ করিতেছে না। তাহারা এ দেশের হাওয়ায় কেবল কড়া সিভিলিয়ান, পুরা সদাগর এবং ষোল-আনা সৈনিক হইয়া পাকিয়া উঠিতে থাকে; এই কারণেই ইহাদের সংস্রবকে আমরা মানুষের সংস্রব বলিয়া অনুভব করিতে পারি না। এইজন্যই যখন কোনো সিভিলিয়ান হাইকোর্ট জজের আসনে বসে তখন আমরা হতাশ হই; কারণ তখন আমরা জানি এ লোকটির হইতে যথার্থ বিচারকের বিচার পাইব না, সিভিলিয়ানের বিচারই পাইব; সে-বিচারের ন্যায়ধর্মের সঙ্গে যেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মের বিরোধ ঘটিবে সেখানে সিভিলিয়ানের ধর্মই জয়ী হইবে। এই ধর্ম ইংরেজের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতিরও বিরুদ্ধ, ভারতবর্ষেরও প্রতিকূল।

আবার যে-ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংরেজের কারবার, সেই ভারতবর্ষের সমাজও নিজের দুর্গতি-দুর্বলতাবশতই ইংরেজের ইংরেজত্বকে উদ্‌বোধিত করিয়া রাখিতে পারিতেছে না; সেইজন্য যথার্থ ইংরেজ এ দেশে আসিলে ভারতবর্ষ যে-ফল পাইত সেই ফল হইতে সে বঞ্চিত হইতেছে। সেইজন্যই পশ্চিমের বণিক সৈনিক এবং আপিস আদালতের বড়ো সাহেবদের সঙ্গেই আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে, পশ্চিমের মানুষের সঙ্গে পূর্বের মানুষের মিলন ঘটিল না। পশ্চিমের সেই মানুষ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই এ দেশে যাহা-কিছু বিপ্লব বিরোধ; আমাদের যাহা-কিছু দুঃখ অপমান; এবং এই যে প্রকাশ পাইতেছে না, এমনকি, প্রকাশ বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সেজন্য আমাদের পক্ষেও যে পাপ আছে, তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’— পরমাত্মা বলহীনের কাছে প্রকাশ পান না; কোনো মহৎ সত্যই বলহীনের দ্বারা লভ্য নহে; যে-ব্যক্তি দেবতাকে চায়, তাহার প্রকৃতিতে দেবতার গুণ থাকা আবশ্যক।

শক্ত কথা বলিয়া বা অকস্মাৎ দুঃসাহসিক কাজ করিয়া বল প্রকাশ হয় না। ত্যাগের দ্বারাই বলের পরিচয় ঘটে। ভারতবাসী যতক্ষণ পর্যন্ত ত্যাগশীলতার দ্বারা শ্রেয়কে বরণ করিয়া না লইবে, ভয়কে স্বার্থকে আরামকে সমগ্র দেশের হিতের জন্য ত্যাগ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ ইংরেজের কাছে যাহা চাহিব তাহাতে ভিক্ষা চাওয়াই হইবে, এবং যাহা পাইব তাহাতে লজ্জা এবং অক্ষমতা বাড়িয়া উঠিবে। নিজের দেশকে যখন আমরা নিজের চেষ্টা নিজের ত্যাগের দ্বারা নিজের করিয়া লইব, যখন দেশের শিক্ষার জন্য স্বাস্থ্যের জন্য আমাদের সমস্ত সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়া দেশের সর্বপ্রকার অভাবমোচন ও উন্নতিসাধনের দ্বারা আমরা দেশের উপর আমাদের সত্য অধিকার স্থাপন করিয়া লইব, তখন দীনভাবে ইংরেজের কাছে দাঁড়াইব না। তখন ভারতবর্ষে, আমরা ইংরেজরাজের সহযোগী হইব, তখন আমাদের সঙ্গে ইংরেজকে আপস করিয়া চলিতে হইবে, তখন আমাদের পক্ষে দীনতা না থাকিলে ইংরেজের পক্ষেও হীনতা প্রকাশ হইবে না। আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বা সামাজিক মূঢ়তাবশত নিজের দেশের লোকের প্রতি মনুষ্যোচিত ব্যবহার না করিতে পারিব, যতক্ষণ আমাদের দেশের জমিদার প্রজাদিগকে নিজের সম্পত্তির অঙ্গমাত্র বলিয়াই গণ্য করিবে, আমাদের দেশের প্রবল পক্ষ দুর্বলকে পদানত করিয়া রাখাই সনাতন রীতি বলিয়া জানিবে, উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণকে পশুর অপেক্ষা ঘৃণা করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইংরেজের নিকট হইতে সদ্‌ব্যবহারকে প্রাপ্য বলিয়া দাবি করিতে পারিব না; ততক্ষণ পর্যন্ত ইংরেজের প্রকৃতিকে আমরা সত্যভাবে উদ্‌বোধিত করিতে পারিব না, এবং ভারতবর্ষ কেবলই বঞ্চিত অপমানিত হইতে থাকিবে। ভারতবর্ষ আজ সকল দিক হইতে শাস্ত্রে ধর্মে সমাজে নিজেকেই নিজে বঞ্চনা ও অপমান করিতেছে; নিজের আত্মাকেই সত্যের দ্বারা ত্যাগের দ্বারা উদ্‌বোধিত করিতেছে না, এইজন্যই অন্যের নিকট হইতে যাহা পাইবার তাহা পাইতেছে না। এইজন্যই পশ্চিমের সঙ্গে মিলন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ হইতেছে

না, সে-মিলনে পূর্ণ ফল জন্মিতেছে না, সে-মিলনে আমরা অপমান এবং পীড়াই ভোগ করিতেছি। ইংরেজকে ছলে বলে ঠেলিয়া ফেলিয়া আমরা এই দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইব না; ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংযোগ পরিপূর্ণ হইলে, এই সংঘাতের সমস্ত প্রয়োজন সমাপ্ত হইয়া যাইবে। তখন ভারতবর্ষে দেশের সঙ্গে দেশের, জাতির সঙ্গে জাতির, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের, চেষ্টার সঙ্গে চেষ্টার যোগসাধন হইবে; তখন বর্তমানে ভারত-ইতিহাসের যে-পর্বটা চলিতেছে, সেটা শেষ হইয়া যাইবে, এবং পৃথিবীর মহত্তর ইতিহাসের মধ্যে সে উত্তীর্ণ হইবে।

(বানান অপরিবর্তিত)

ভারতে বিগত কয়েক বছরে ‘জাতীয়তাবাদ’-এর নামে আরএসএস ও বিজেপি আদতে ‘হিন্দুত্বের’ সংকীর্ণ বিভেদমূলক রাজনীতির প্রচার করছে। ভারতবর্ষকে রবীন্দ্রনাথ তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এক এমন দেশ হিসেবে কল্পনা করেছিলেন যা সমস্ত সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থাকবে। আমরা ‘পুনঃপাঠ’ বিভাগে জাতীয়তাবাদের এই সমন্বয়ী ধারণার দিকে ফিরে তাকাব। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সংকলন ‘সমাজ’ থেকে এই প্রবন্ধটি ছাপা হল।

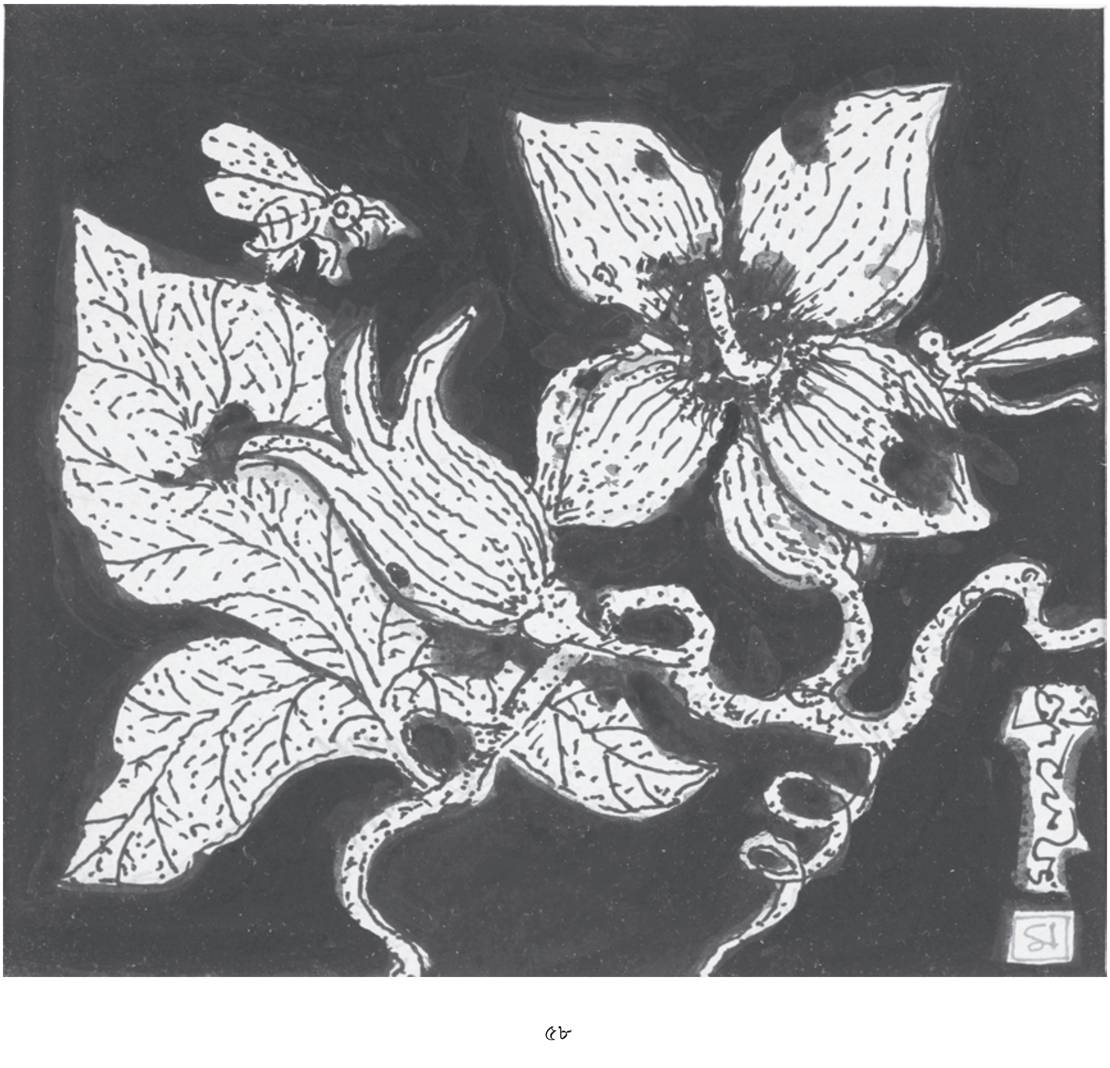

mio amore™

THE CAKE SHOP

Issue date 16 March 2019. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 7, Issue 6 Arek Rakam

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.